ভারতে শক্তিপূজা

স্বামী সারদানন্দ

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রাবণ, ১৩৩৫

[মূল্য ।।০ আনা]

উৎসর্গ

যাঁহাদের করুণাপাঙ্গে, গ্রন্থকার জগতের যাবতীয় নারীমূর্ত্তির ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার বিশেষ শক্তিপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছে তাঁহাদেরই শ্রীপাদপদ্মে এই পুস্তিকাখানি ভক্তিপূর্ণচিত্তে অর্পিত হইল। ইতি—

প্রণত গ্রন্থকার

নিবেদন

"ভারতে শক্তিপূজা"র প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। সাধারণে ইহার আদর দেখিলে, দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশের ইচ্ছা রহিল।* শক্তিপূজা, বিশেষতঃ মাতৃভাবে শক্তিপূজা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। মাতৃ ভিন্ন অন্য ভাবের শক্তিপূজার কিছু কিছু মাত্রই অন্যান্য দেশে লক্ষিত হইয়া থাকে! বাস্তবিক জগৎকারণকে 'মা' বলিয়া 'জগদম্বা বলিয়া ডাকা একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়! আবার বহুকাল পবিত্র ও সংযত ভাবে শক্তি-পূজার ফলে ভারতের ঋষিরাই প্রথম জ্ঞাত হইয়া প্রচার করিয়াছেন যে, জগদম্বা সগুণা এবং নির্গুণা উভয়ই। পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া বলিয়া ভারতের দর্শনকার যে দুই পদার্থ জগতের মূলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা একই বস্তুর একই কালে বিদ্যমান, দুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশবিশেষ। তবে দেশকালাবচ্ছিন্ন বা নামরূপাব-লম্বনে সবাহ্যান্তর্জ্জগৎ-উপলব্ধিকারী মানবমন একই

---

* গ্রন্থকারের এ অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তিনি বিগত ১৩৩৪ সালের ১লা ভাদ্র দেহ রক্ষা করেন।

কালে, একেবারে জগদম্বার ঐ দুই ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে অক্ষম। কারণ মানবমন স্বভাবতঃ এমন উপাদানে গঠিত যে, উহা আলোকান্ধকারের ন্যায় পরস্পরবিরুদ্ধ দুইটি ভাবকে একত্রে একই সময়ে গ্রহণে অপারগ। সেজন্য দেশকালাবচ্ছিন্ন সগুণ ভাবের উপলব্ধির সময় সে জগদম্বার নির্গুণ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না; এবং সমাধি সময়ে উচ্চ ভূমিকায় আরোহণ করিয়া যখন সে জগন্মাতার নির্গুণ স্বরূপের প্রত্যক্ষ করে, তখন আর তাহার নয়নে তাঁহার সগুণ ভাবের ও সগুণ-ভাবপ্রসূত জগতের উপলব্ধি হয় না। তবে সমাধিভূমি হইতে নামিয়া পুনরায় সাধারণভাব প্রাপ্ত হইলেও তাহার সমাধিকালানুভূত জগদম্বার নির্গুণ ভাবের যে কতকটা স্মৃতি থাকিয়া যায়, তাহাতেই সে নিঃসংশয় বুঝিতে পারে, তিনি নির্গুণা ও সগুণা উভয়ই। সে জন্য জগৎকারণের স্বরূপসম্বন্ধীয় পূর্ণ সত্য উপলব্ধি করিবার একমাত্র পথই যে নির্বিকল্প সমাধিলাভ, একথা ভারতের সকল ঋষি ও দর্শনকারই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

প্রতীকাবলম্বনে শক্তিপূজা যে ঐ সমাধিলাভের সহায়ক, একথাও ভারতের ঋষি ও আচার্য্যেরা আবহমানকাল হইতে নিজেরা উপলব্ধি করিয়া জন-

সাধারণে প্রচার করিয়া আসিতেছেন। প্রশ্ন উঠিতে পারে—প্রতীক কাহাকে বলে? শাস্ত্রকার বলেন—আন্তর ও বাহ্যজগতের অন্তর্গত যে সকল বিশেষ শক্তিশালী পদার্থ মানবমনে স্বভাবতঃ অন্তরের ভাব উদিত করিয়া তাহাকে জগৎ কারণের অনুসন্ধান ও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকরণে নিযুক্ত করে, তাহাকেই প্রতীক বলে। আর ধাতু, প্রস্তর বা মৃত্তিকাদি কোন প্রকারেই পদার্থগঠিত কৃত্রিম মূর্ত্তিবিশেষে, জগৎকারণের সৃষ্টি-স্থিত্যাদি গুণরাশির আরোপ বা আবেশ কল্পনা করিয়া পূজাধ্যানাদি-সহায়ে জগন্মাতার সাক্ষাৎ স্বরূপের উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করাকেই প্রতিমাপূজা বলে। "অব্রহ্মণি ব্রহ্মদৃষ্ট্যানুসন্ধানং"—অর্থাৎ যাহা সসীম-স্বভাবহেতু পূর্ণব্রহ্ম নহে, ঐ প্রকার কোন পদার্থ বা প্রাণীকে ব্রহ্ম বলিয়া ধরিয়া লইয়া পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপানুভূতির চেষ্টা করার নামই প্রতীক ও প্রতিমাপূজা।

আবার স্বল্প চিন্তার ফলেই প্রতীতি হইবে যে প্রত্যেক প্রতীক বা প্রতিমার পশ্চাতে সাধক চিরকাল জগৎকারণের গুণ বা শক্তিবিশেষেরই পরিচয় পাইয়া বা আরোপ করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া আসিয়াছে। অতএব অসংখ্য সম্প্রদায়ে বিভক্ত-সাধকগণ অগণ্য দেব-দেবীর মূর্ত্তি অবলম্বনে আবহ-

মানকাল ধরিয়া কোনও না কোনও ভাবে যে শক্তি-পূজাই করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও যে তাহাই করিতেছে, এ বিষয় বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। বাস্তবিক সাধক জগৎকারণকে পুরুষ বা স্ত্রী যে ভাবেই গ্রহণ করুক না কেন, তাহার নিজ প্রকৃতিগত সংস্কারের অধীন হইয়াই উহা করিয়া থাকে এবং ঐ ভাবাবলম্বনে জগৎকারণের শক্তিরই পূজা করিয়া থাকে।

যে কোনও ভাবাবলম্বনে যে কোন প্রতীকেই জগচ্ছক্তির উপাসনা করা হউক না কেন, উহাতে সাধকের মনের সম্পূর্ণ অনুরাগ না পড়িলে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না। ঐ সম্পূর্ণ অনুরাগ বা ভক্তিই তাহাকে ধীরে ধীরে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করাইয়া সর্ব্বপ্রকার স্বার্থানুসন্ধানের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়া দেয়। যে ভাবাবলম্বনেই সাধক সাধনায় প্রবৃত্ত হউক না কেন এবং সাধনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার মনে যতই স্বার্থপরতা এবং ভোগসুখেচ্ছা থাকুক না কেন, কোনরূপে একবার তাহার মনে আপন উপাস্যের উপর একবিন্দু যথার্থ অনুরাগ উপস্থিত হইলে, আর তাহার বিনাশ নাই। ঐ অনুরাগসহায়ে তাহার ঐ ভাবাঙ্কুর ধীরে ধীরে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ঐ ভাবসিদ্ধির জন্য কালে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বার্থবলি বা

আত্মবলি দিতে সক্ষম করে। জগৎকারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের জন্য, প্রবল অনুরাগে, সর্ব্বপ্রকার ভোগসুখ মন হইতে এককালে ঐরূপ ত্যাগ করাকে নানা দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র নানাভাবে ও ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশাহি ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়াছেন—'Death of the old man' -পুরাতন মানবের মৃত্যু; ভারতের দার্শনিক বলিয়াছেন—ত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাহায্যে মনের নাশ করা; তন্ত্রকার বলিয়াছেন—দেবীর সম্মুখে আত্মবলিদান দেওয়া; যোগী বলিয়াছেন—পূর্ণ একাগ্রতা বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। নানা জাতির ভিতর ঐরূপে ঐ একই মানসিক অবস্থা যে কতপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

ভারতের ঋষি এবং আচার্য্যেরা আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি বা সংস্কারবিশিষ্ট সাধকের পক্ষে জগৎকারণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবাশ্রয়ে উপাসনা ইষ্ট বলিয়া প্রচার করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের ভাবসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন মার্গের উপাসনা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এক ভাবের উপযোগী মার্গবিশেষের উপাসনার সহিত অন্যভাবোপযোগী অন্য মার্গের উপাসনার বিশেষ প্রভেদ যে বিদ্যমান, একথা আর বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই এবং তজ্জন্যই গ্রাম্যকথায় যেমন বলে—'যে বিবাহের যে মন্ত্র, তাহার

উচ্চারণ চাই'—অথবা সাধক যে ভাবসিদ্ধি-বাসনায় উপাসনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছে, তদুপযোগী মার্গেই তাহার অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা ফলসিদ্ধি সুদূর-পরাহত থাকিবে। বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখ্য, বাৎসল্যাদি ভাবসিদ্ধির জন্য ৺কালীপূজা করিয়া বীরাচারে ভোগ-রাগাদির অনুষ্ঠানে কখনই ফলসিদ্ধি হইবে না। 'গুরু ব্র্হ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ'—ইত্যাদি মন্ত্র পাঠই করিলাম অথচ গুরুকে সুখী করিতে যথাসাধ্য সেবা ও অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইলাম, "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু"—"হে দেবি তুমিই যাবতীয় স্ত্রীমূর্ত্তিরূপে আপনি প্রকাশিতা হইয়া রহিয়াছ"—ইত্যাদি চণ্ডীতে লিপিবদ্ধ স্তবাদি পাঠ করিয়াই আবার পরক্ষণে মাতা, জায়া বা দুহিতার উপর নির্দ্দয় ব্যবহার করিলাম!—ঐরূপেও ভাবসিদ্ধি হইতে পারে না। এই প্রকার সর্ব্বভাবসিদ্ধি সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে।' অতএব আপন গন্তব্য পথে নিষ্ঠা রাখা, ভাবের ঘরে চুরি না করা এবং জগদম্বার স্বরূপ উপলব্ধির সহায় হইবে বলিয়া যে ভাবে যে প্রতীকই অবলম্বন করিয়া থাকি না কেন, ঐ প্রতীকটিই তিনি—অপর সকল বস্তু ও ব্যক্তি তিনি নহেন—এরূপ সঙ্কীর্ণ ভাব যাহাতে মনে উদয় না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা—এই কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেই প্রতীকোপাসনা অশেষ

মঙ্গলের হেতু হইয়া চরমে সাধককে সমাধি-ধনে ধনী করিয়া থাকে।

আর এক কথা—আমাদের পূর্ব্বোক্ত বক্তব্য বিষয় পাঠকের সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আমরা পুস্তকের স্থলে স্থলে ব্যবহারিক জগতের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী প্রভৃতি দৃষ্টান্তরূপে প্রয়োগ করিয়াছি। বর্ত্তমান সময়ের বিপ্লবাদীরা অনেক সময়ে ঐরূপে ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের ভাষাবরণে আপনাদের গুপ্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করায় কেহ না ভাবিয়া বসেন—আমরাও তদ্রূপ করিয়াছি বা আমাদের তাহাদের সহিত কিছুমাত্র সহানুভূতি আছে! তজ্জন্য এস্থলে স্পষ্ট বলিয়া রাখা ভাল যে অশ্রদ্ধা, হঠকারিতা, অবিবেচকতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাতেই ঐ দলের জন্ম। রাজার মনে অনর্থক সন্দেহ উৎপাদন করিয়া উহারা ভারতের সমগ্র রাজভক্ত প্রজার সমূহ অকল্যাণ ও ক্ষতি সাধিত করিয়াছে; উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দিয়া ভদ্রবংশীয় বালকদিগকে হীন দস্যুতস্করাদিতে পরিণত করিয়াছে; এবং ধর্ম্মের ভাণে স্বার্থসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য ও সমাধিপূত গৈরিক বসনে জুয়াচুরির কলঙ্ককালিমা অর্পণেও কুণ্ঠিত হয় নাই! ইউরোপীয়দিগের ভিতর একটি প্রবাদ আছে যে, 'সয়তানও স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত

করিয়া থাকে।' ইহাদের অধিকাংশের পর পর কার্য্যকলাপ দেখিয়া সহানুভূতি হওয়া দূরে থাকুক, ঐ কথারই মনে উদয় হয়। বলা বাহুল্য, উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসত্য কখনও কোন কালে, ধর্ম্ম দূরে থাকুক, কোনও বিষয়েই উন্নতিলাভের সোপান হইতে পারে না। অলমতিবিস্তরেণ—ইতি

গ্রন্থকারস্য

স্বামী সারদানন্দ

ভারতে শক্তিপূজা

প্রথম প্রস্তাব

শক্তিতত্ত্ব ও পূজাপদ্ধতি

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

"জড়, চেতন, সকলের মধ্যে কোথাও গুপ্ত, কোথাও ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী দেবীকে আমরা বার বার প্রণাম করি।"

হে পাঠক! নবযুগে নবোদ্যমে সনাতনী শক্তি আবার জাগরিতা! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক ত্যাগ তপস্যা ও নিরন্তর সপ্রেমাহ্বানে ইনি প্রবুদ্ধা হইয়াছেন এবং নরদেব শ্রীবিবেকানন্দের গুরুগত-প্রাণতায় প্রসন্না হইয়া পরমকল্যাণে নিযুক্তা হইয়াছেন!

অতএব সমগ্র ভারত এবং কালে সমগ্র পৃথিবীও যে ইঁহার পবিত্র স্পর্শে নবভাবে পূর্ণা হইয়া একদিন কৃতার্থ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, ব্রহ্মসদ্ভাবে ব্রহ্মশক্তি—সর্ব্বদা অমোঘ, অবিনাশী—সর্ব্বান্তর্নিহিত থাকিয়া সর্ব্বদা সকলের নিয়মনকরী!

শক্তির বিচিত্র প্রভাবেই সর্ষপতুল্য বীজে বিশাল বৃক্ষ, মাংসপিণ্ড মনুষ্যশরীরে জড়জগন্নিয়ামিকা চৈতন্যময়ী বুদ্ধি এবং আকাশাপেক্ষাও তরল, ইন্দ্রিয়াতীত মনে সমস্ত বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে! সাধারণ শক্তির প্রভাবই যখন এমন অদ্ভুত, তখন অন্তর্জগন্নিয়ামিকা আধ্যাত্মিক শক্তির মহিমার কিরূপে ইয়ত্তা হইবে? কেনই বা না জগৎ আবহমান কাল ধরিয়া উহার পূজায় প্রাণপাতে অগ্রসর হইবে? আবার জগতে নবপ্রবোধিতা শক্তির পূজা প্রসারিত হইবে! আবার ভারত, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবোধিত সনাতনী ব্রহ্মশক্তির পূজা করিয়া নিজে ধন্য হইবে এবং অপরকে ধন্য করিবে! অতএব শক্তিতত্ত্ব এবং শক্তিপূজা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবার ইহাই উপযুক্ত কাল।

শুভ্রশির বেদ বলেন—প্রচীনা হইলেও শক্তি নিত্যা নবীনা! গুপ্তভাব হইতে ব্যক্তা হইলেই নবীনা বলিয়া

প্রতীয়মানা। নতুবা শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "চিকের আড়ালে দেবী সর্ব্বদাই রহিয়াছেন।" শক্তির হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, লোপ ত দূরের কথা। ঘন বা সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া দেখিয়াই আমরা উহার কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি, আবার কখন বা একেবারে লোপ কল্পনা করিয়া থাকি মাত্র।

এক শক্তিই কতবার গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্তভাব প্রাপ্ত হইল, কে তাহা বলিতে পারে? যতবার ব্যক্ত, ততবার নূতন। যতবার গুপ্ত, ততবার লুপ্ত বলিয়া অনুভূত হইল! কালে কালে এই খেলা চলিয়াছে। দেশ, মহাদেশ, পৃথিবী, অখিল জগৎ লইয়া—জাতি, সমাজ, প্রত্যেক পরিবার এবং ব্যক্তিকে লইয়া এই খেলা নিত্য চলিয়াছে। কত গ্রহ চূর্ণিত এবং কত গ্রহ পুনর্গঠিত হইল, কত দেশ পর্ব্বতায়িত এবং কতই বা সমুদ্রকবলিত হইল, কে নির্ণয়ে সক্ষম? এক গ্রহ বা পৃথিব্যন্তরস্থ এক দেশের কতবারই বা এই দশা হইল, তাহাই বা কে বলে? তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে সমুদ্র-গর্জ্জনের এবং সমুদ্রগর্ভে দেশ-জনপদের অস্তিত্বের ইতি-হাস বর্ত্তমান! প্রসিদ্ধিই আছে, 'শতবর্ষে জনপদ, আবার শতবর্ষে অরণ্য।'

এইরূপে কত জাতি ও সমাজ উন্নত, অবনত এবং পুনরায় উত্থিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে? আবার, শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যে ব্যক্তিগত শক্তির তারতম্য কেই বা না প্রত্যক্ষ করিয়াছে? পুনর্জ্জন্মে সেই শক্তির পুনর্বিকাশ, ভারতের কোন্ যোগী ঋষিই না অনুভব করিয়াছেন? এতএব ভাবিয়া দেখিলে—প্রফুল্ল-কমলোপরি অধিষ্ঠিতা, লঘুকায়া, অপূর্ব্ব সুন্দরীর পুনঃ পুনঃ গজগ্রাস এবং গজউদ্গার করিবার কথা আর কবিকল্পনা বলিয়াই মনে হয় না! অথবা দেবর্ষি নারদ-দৃষ্ট ভাগবতী মায়ার—সূচীছিদ্রে বারংবার হস্তী প্রবিষ্ট এবং নির্গত করাইবার কথাতেও আর সন্দিহান হওয়া যায় না! ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন জগজ্জননী মহামায়ার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইতে অভিলাষী হইয়া দেখিয়াছিলেন—অনুপমা সুন্দরী নারী, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্র প্রসবে এবং লালন পালনে অশেষ আয়াস স্বীকার করিয়া আবার তাহাকে কিছুকাল পরে সহর্ষে গ্রাস করিলেন!—শক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিলে, শক্তি যে একাধারে প্রসব ও প্রলয়রূপ বিপরীত গুণধারিণী, এ কথাই পরম সত্য বলিয়া অনুভূত হয়। আধুনিক দার্শনিকও সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, শক্তির বিনাশ

বা পরিমাণের হ্রাস নাই। গুপ্ত ও ব্যক্তভাব হয় মাত্র।

ভাবরাজ্যেও তাহাই।—ভাবরাজ্যে বা সূক্ষ্ম মনোরাজ্যেও শক্তির এই খেলা বর্ত্তমান। এক জাতি, সমাজ বা ব্যক্তি-উপলব্ধ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক ভাব কালে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, পরিণত এবং লুপ্ত হইয়া আবার সেই ভাবতরঙ্গ অপর জাতি বা সমাজ বা ব্যক্তির ভিতর প্রবিষ্ট ও প্রকাশিত হইয়া নূতন বলিয়া উপলব্ধ হয়। মহাশক্তির বিচিত্র লীলায় ঐ দ্বিতীয় জাতি উহার পুরাতনত্ব আদৌ অনুভব না করিয়া ভাবে, এ ভাব জগতে আর কখনও উদিত হয় নাই, এবং মদ গর্ব্বে স্ফীত হইয়া জটিল জীবনসমস্যার এক অপূর্ব্ব সরল সমাধান তৎকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত, এই কথা প্রচার করে!

আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকাই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। প্রাচীন ভারত, মিসর, গ্রীস ও অন্যান্য দেশের সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং অপরাপর ভাবতরঙ্গ এখন ঐ সকল দেশে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত এবং পুষ্ট হইয়া সমুত্থিত হওয়ায় ঐ সমস্ত দেশবাসীর মদগর্ব্ব প্রত্যক্ষ। পাশ্চাত্য দার্শনিক! তুমি ক্রমবিকাশ, স্ত্রী-নির্ব্বাচন, সন্তানানুগত পিতৃগুণবাদ ইত্যাদি লইয়া

'জীবনশঙ্কার সরল সমাধান আবিষ্কৃত' বলিয়া সমগ্র জগৎকে আহ্বান করিতেছ—কিন্তু বৃথা গর্ব্ব। ভাব-তরঙ্গ আবার স্থানান্তরিত হইবে—আলোকের পর অন্ধকার এবং জীবনের পর মৃত্যু আবার আসিয়া উপস্থিত হইবে। জীবনশঙ্কার একটা জাতিগত সমাধান দূর-পরাহতই থাকিবে! তবে ব্যক্তিগত সমাধান?—আবহ-মানকাল ধরিয়া যাহা হইয়াছে—'ঘুড়ি লক্ষে দুটা একটাই কাটিয়াছে' ও কাটিবে।

ইউরোপ! তুমি ক্ষাত্রশক্তি এবং বৈশ্যশক্তির উপা-সনায় হৃদয়ের শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়াছ। সেই কঠোর তপস্যাই তোমায় উন্নতশির করিয়াছে। আমে-রিকা! তুমি ঐ দুই শক্তির সহিত আবার শূদ্রশক্তির আরাধনে তৎপর। তজ্জন্যই তোমার এত শীঘ্র জাতীয় উন্নতি। কিন্তু আবার তোমরা মহাশক্তির আরাধনায় অবহেলা করিবে এবং কালে ভুলিয়া যাইবে। আবার সেই "সহস্রপরমা শতমূলা শতাঙ্কুরা" দূর্ব্বাদেবী অন্যের আরা-ধনায় প্রসন্না হইয়া অন্যত্র উদিতা হইবেন। ইহাই নিয়ম!

গুপ্ত হইতে ব্যক্ত এবং ব্যক্ত হইতে গুপ্ত—শক্তির এই দুই ভাবের খেলা জগতে নিরন্তর সর্ব্বত্র বিরাজিত। যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিতে শক্তির প্রথমোক্ত ভাবের

খেলা হইতেছে, তাহাকেই আমরা জীবন্ত, উন্নতিশীল এবং ভাগ্যবান্ বলিয়া বোধ করিতেছি এবং যাহাতে শেষোক্ত ভাবের খেলা, তাহাতেই বার্দ্ধক্য, শ্রীহীনতা, অবনতি এবং মৃত্যুর ছায়া উপলব্ধি করিতেছি'।

আবার, বহুকাল গুপ্তভাবে অবস্থিত শক্তির বিকাশ যে শরীর-মন আশ্রয়ে হয়, বা ব্যক্ত শক্তির কার্য্যক্রম যাঁহার দ্বারা যথাযথ পঠিত হয়, শ্রদ্ধাভক্তিপ্রণোদিত হইয়া তাঁহাকে আমরা কতই না উচ্চাসন প্রদান করিতে বাধ্য হই! জড়রাজ্যে তিনি—আবিষ্কারক, মনোরাজ্যে—দার্শনিক, এবং ধর্ম্মরাজ্যে—মুক্তস্বভাব ঋষি অথবা শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহধারী অবতার!

পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু স্পর্শ করিতেছি, মনের দ্বারা যাহা কিছু চিন্তা, বা কল্পনা দ্বারা যাহা কিছু অনুমান ও গঠন করিতেছি, সকলই শক্তিসহায়ে, সকলই শক্তিরাজ্যের অধিকারভুক্ত। বেদমুখে দেবী বলিতেছেন—

> "ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি।
> যঃ প্রাণিতি যঃ ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
> অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি
> শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥

*　　　*　　　*　　　*

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ হ॥"

ঋক্—দেবী সূক্ত।

"আমার দ্বারাই লোকে জীবিত রহিয়াছে, অন্নগ্রহণ এবং শ্রবণাদি করিতেছে। আমাকে যে অবহেলা করে সে বিনষ্ট হয়। তুমি শ্রদ্ধাবান, এইজন্য তোমাকে এসকল বলিতেছি। ব্রহ্মশক্তির হিংসক অসুরদিগের বধের নিমিত্ত ধনুর্ধারী রুদ্রের বাহুতে আমিই শক্তিরূপে অবস্থিতা ছিলাম। আমিই লোকরক্ষার জন্য যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্তা হই। আমিই আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া রহিয়াছি।"

শক্তিরাজ্যের পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত বিস্তৃতি যিনি একবার উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি বুঝিয়াছেন যে, শক্তিপূজাতেই জগৎ চিরকাল ব্যাপৃত। শক্তি আরাধনা ভিন্ন সংসারে অন্য কোনরূপ উপাসনাই কখন হয় নাই বা হইবে না! জড়, চেতন, সকলেই যুগযুগান্তর ধরিয়া আজীবন শক্তি আরাধনায় ব্যস্ত থাকিয়াও পূজা সাঙ্গ করিতে পারিতেছে

না। পারিবে কি কোন কালে? যদি পারে, সেও শক্তিসহায়ে—

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৄণাং ভবতি মুক্তয়ে।"

প্রসিদ্ধি আছে, শক্তিপূজার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, বিশেষতঃ কলিতে; অন্য দেবতা সব নিদ্রিত; শক্তিপূজাসম্বন্ধীয় তন্ত্রসমূহ ভিন্ন অন্য শাস্ত্র সমূহের নির্ব্বিষ ভূজগের ন্যায় বৃথাস্ফালন। কথাটা সম্পূর্ণ না হউক, কতক সত্য বটে। কারণ, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, মানুষ জড় বা মনোরাজ্যে যাহা কিছু অধিকার লাভ করিয়াছে, সব শক্তি আরাধনার ফলে। জড়শক্তি বলিয়া যাহা সাধারণ মানবের প্রত্যক্ষগোচর, তদারাধনার ফলেই তাহার শারীর বিজ্ঞান, ভূত-বিজ্ঞান, রোগ-শান্তি, মহামারীর প্রতিবিধান, আহার-সংস্থান, ধনাগমের বিবিধ উপায়, যুদ্ধবিগ্রহের উপযোগী অস্ত্র শস্ত্র প্রভৃতি করতলগত। তেমনি, মানসিক শক্তি বলিয়া যাহা পরিচিত, তদুপাসনায় মানবের মনোবিজ্ঞান, কবিত্ব, সংযম, বিবাহবিধান, সভ্যতা, নীতি, সমাজগঠন, রাজ-নীতি প্রভৃতি, এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্বোধনে ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, সন্তোষ, শমদমাদি সাধনসম্পত্তি এবং পরিশেষে সর্ব্ববাধাবিনির্ম্মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থও তাহার

আয়ত্তীভূত! অবশ্য ঐ সকল বহুলোকের বহুকাল ধরিয়া বহুভাবে শক্তি উপাসনার ফলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মানুষ সর্ব্বকালে যতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত যে কোনও শক্তির যে পরিমাণে উপাসনা করিয়াছে, সেই পরিমাণে ফলও হাতে হাতে পাইয়াছে। একালের উপাসকদেরও এ কথা প্রত্যক্ষানুভূত।

তবে অঙ্গহীন হইলে বা বিধি ও শ্রদ্ধা-বিরহিত হইলে পূজার সম্পূর্ণ ফললাভ অসম্ভব এবং সময়ে সময়ে বিপরীত ফলও ঘটিয়া থাকে। যে পূজায় যে যে উপকরণ আবশ্যক, তাহা আয়াসসাধ্য হইলেও একত্র করিতে হইবে; যে কারণসমূহের সংযোগে যে বিশেষ ফলের উৎপত্তি, সে সমূহের একত্র সংযোগ চাই। এ কথাটি যেমন বড়ই সোজা, তেমনি বার বার মানুষ ভুলিয়া যায়। এদেশে আমরা একথাটি আজ কাল' কতই না ভুলিয়াছি!—ফলও তদ্রূপ পাইতেছি! সমগ্র দেশ আজ শক্তিপূজার আড়ম্বরে ব্যস্ত থাকিয়াও নির্ব্বীর্য্য, ধর্ম্মহীন, বিদ্যাহীন, ধনহীন, অন্নহীন, শ্রীহীন। দোষ—পূজাবিধির ব্যতিক্রম। রসায়ন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে বলিয়া যদি কেহ ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন এবং নির্জ্জনে বীজমন্ত্র জপ করিতে থাকে,

তাহার ফল-প্রত্যাশা কোথায় ? তাহার ইষ্টশক্তি-উপাসনা অঙ্গহীন। মহামারীর প্রতিবিধান উদ্দেশ্যে যদি কেহ বাহ্যশৌচের বিধানসকল সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া, খাদ্য-পানীয়ের বিচার ন' রাখিয়া কেবলমাত্র কয়েক ঘণ্টা উচ্চরোলে হরিসঙ্কীর্ত্তন করে, তবে তাহার চেষ্টা বাতুলতা ভিন্ন আর কি বলা যাইবে ? তাহার ইষ্টপূজার উপকরণসমূহের অত্যন্তাভাব। দুর্ভিক্ষের করালবদন হইতে দেশোদ্ধার করিবে বলিয়া যদি কেহ কেবলমাত্র রক্ষাকালীর পূজা দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, নূতন উপায়ে অর্থাগম, অন্নবৃদ্ধি এবং অন্যান্য উপযোগী উপায়সকলের প্রতি লক্ষ্য ও চিন্তা না রাখে, তাহার আরাধনাও অঙ্গহীন বৈ আর কি বলা যাইবে ? স্বদেশের কল্যাণ-সাধনের জন্য যিনি অহরহঃ বক্তৃতা দানেই ব্যস্ত, কিন্তু একবিন্দু স্বার্থত্যাগে সর্ব্বদাই পশ্চাৎপদ, তাঁহার উপাসনাই বা কি ফল প্রদান করিবে ? কথায় বলে, "যে বিবাহের যে মন্ত্র" তাহার উচ্চারণ চাই। এইরূপ শ্রদ্ধাহীন, বিধিহীন, মন্ত্রহীন, অদক্ষিণ পূজা করিয়া বলিব, 'পূজার ফল ত পাইলাম না।' হায় মানব! তোমার সহজ বুদ্ধির কি একান্ত অভাবই হইয়াছে! শাস্ত্র ত তোমায় বার বার বলিতেছেন,

কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পাঁচটি কারণের প্রয়োজন—

"অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম।

বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম॥ গীতা।"

যথা—উপযুক্ত দেশ, উদ্যমশীল কর্ত্তা, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাম, বার বার উদ্যম এবং দৈব। সহজ জ্ঞানেও ত বার বার উপলব্ধি করিতেছ যে, এক হস্তে দৈব এবং অপর হস্তে পুরুষকারকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিলে তবেই গন্তব্য পথে অগ্রসর হওয়া যায়। নতুবা পুরুষকারসহায়ে চেষ্টা ও নির্ভরশীলতা এতদুভয় তোমায় ভগবান্ কেন দিয়াছেন? একবার সোজাসুজি ভাবিয়া দেখ দেখি, ভারতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণ যে মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতিতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কি কেবল মন্ত্রজপ প্রভাবে বা চেষ্টারহিত হইয়া কেবলমাত্র দৈবের উপর নির্ভর করিয়া? ভারতের তান্ত্রিক অবধূতেরা যে সকল ধাতুঘটিত ঔষধ এবং বিবিধ বিষপ্রয়োগে বিবিধ রোগ-শান্তির উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে কতই না নির্ভীক উদ্যম এবং পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়! কত সাধকের অনুরাগ-ভক্তিপূত হৃদয়ের শক্তিপূজার

ফলেই না ঐ সকলের এক একটি আবিষ্কৃত হইয়াছে! এখন বিষয়বিশেষের প্রতি অনুরাগ-ভক্তিতে কেহ হৃদয়ের শোণিতবিন্দু শুষ্ক করিতেছে দেখিলে, তুমি চক্ষু নিমীলন কর; বলিদানের বা স্বার্থত্যাগের নাম শুনিলে একবারে হতজ্ঞান হও। কিন্তু ঐ শুন, ভারতের ঋষি কার্য্যে দেখাইয়া চিরকাল ঘোষণা করিতেছেন—শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত ধীরভাবে যথাযথ উপায় অবলম্বন কর, সকল কষ্ট সহ্য করিয়া বিন্দু বিন্দু হৃদয়ের শোণিতপাত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া শক্তির উদ্বোধন এবং তর্পণ কর, আপনার প্রিয় যাহা কিছু এবং অতি প্রিয় দেহ মন পর্য্যন্ত ইষ্টলাভোদ্দেশ্যে দেবীর সম্মুখে বলিদান দাও, দেখিবে, নবজীবনের সহিত যে উদ্দেশ্যে তুমি পূজা করিতেছ, তাহা সিদ্ধ হইবে এবং তোমার একাঙ্গী ভক্তিপূত সাধনায় তোমার কুল, জাতি ও দেশের মহাকল্যাণ সাধিত হইবে; আপনি ধন্য হইয়া তুমি অপর সাধারণকেও ধন্য করিবে।

বলিপ্রদান বা সম্পূর্ণ স্বার্থত্যাগ ভিন্ন শক্তিপূজা অসম্পূর্ণ, ফলও তদ্রূপ। ছাগ-মহিষ-বলি ত অনুকল্প মাত্র। হৃদয়ের শোণিত দান, যে উদ্দেশ্যে পূজা সে উদ্দেশ্যে আপনার সমগ্র শরীর মন সম্পূর্ণ উৎসর্গ না

করিলে কোন প্রকার শক্তিপূজাতেই ফলসিদ্ধি অসম্ভব। বেদ বলেন, "ত্যাগনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ," ত্যাগই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমর হইবার একমাত্র উপায়। কেবল আত্মজ্ঞান কেন, স্বার্থসুখ ত্যাগ না করিলে জগতে কোন মহৎ বিষয়ই লাভ হয় না এবং ঐ ত্যাগই শক্তিপূজাপদ্ধতির বলি এবং হোমের একমাত্র লক্ষ্য। সর্ব্বত্যাগে অমরত্ব-লাভ, বিদ্যার জন্য ত্যাগে বিদ্যালাভ, ধন-জন্য ত্যাগে ধনলাভ, প্রভুত্বের জন্য ত্যাগে প্রভুত্বলাভ, এইরূপ অপরাপর বিষয়েও ত্যাগ বা বলি-মাহাত্ম্য নিত্য-প্রত্যক্ষ। ঐ সকল বিষয় উপার্জ্জন করিবার উপায়—ত্যাগ, এবং রক্ষা করিবার উপায়ও—ত্যাগ,—ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষ।

যে কোন উদ্দেশ্যেই হউক, শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে, বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ করিতে হইবে, সর্ব্ব শক্তির আকর অন্তরস্থ আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহা হইতে শক্তি অবতরণের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে; এবং পরে, সম্যক শ্রদ্ধার সহিত আবাহন, পূজা এবং আত্মবলিদান করিয়া মহাশক্তির প্রসন্নতা লাভ করিতে হইবে। তবেই দেবী বরদা হইয়া, সাধকের প্রাণ মনে অভিনব অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার করিয়া ঈপ্সিত অর্থে

সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবেন এবং উহাতেই ফলসিদ্ধি করতলগত হইবে। করিবার যাহা কিছু তিনিই করিবেন, সাধকের মন প্রাণ কেবল নিমিত্ত মাত্র হইবে।

অতএব বিঘ্নোৎসারণ, ভূতবলি, ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি পূজার পূর্ব্বে করণীয় বিষয়গুলির উদ্দেশ্যই সাধকের বৃথা শক্তিক্ষয় নিবারণ। যে উপায়েই হউক বৃথাশক্তিক্ষয় নিবারিত হইলেই তুমি উদ্দিষ্ট বিষয় লাভের প্রথম সোপানে আরোহণ করিলে; অন্তর্নিহিত পরমাত্মার ধ্যানে উদ্দিষ্ট বিষয় লাভের জন্য যে বিশেষ শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমাতে উদ্বোধিত হইল; পূজা ও স্বার্থত্যাগে সেই শক্তি সঞ্চিত, ঘনাভূত ও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইল; এবং পরিশেষে সেই নবশক্তির নিয়োগে অভীষ্ট ফল করতলগত হইল। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বফলসিদ্ধির সম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত। শক্তিক্ষয় নিবারণ, আত্মনিহিত মহাশক্তির ধ্যান এবং আত্মবলিদান। শঙ্খ, ঘণ্টা, ধূপ, দীপাদির আড়ম্বর থাকুক আর নাই থাকুক, সর্ব্বপ্রকার শক্তি সাধকের অন্তরেই নিহিত রহিয়াছে—এ কথা জানুক আর নাই জানুক, এবং শক্তিবিশেষের আপনাতে প্রকাশিত করিবার পূর্ব্বোক্ত ক্রমোপায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত

থাকুক, তথাপি অভীষ্ট বিষয়ের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও ধ্যানই যে একমাত্র সর্ব্বকালে সর্ব্বসাধককে পূর্ব্বোক্ত ক্রমের ভিতর দিয়া ফলসিদ্ধি প্রদান করিয়াছে, একথা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের অনেকেই শক্তিকে জড়া বলিয়া থাকেন। জড়পরমাণুপুঞ্জে জড়শক্তির খেলা ভিন্ন আর কিছুই তাঁহাদের চক্ষুগোচর হয় না। বিচিত্র বহির্জগৎ এবং তদপেক্ষা সমধিক বিস্ময়কর মানবের অন্তর্জগৎও পূর্ব্বোক্ত জড় পিতামাতার জড়-লীলাপ্রসূত জড়সন্তান, এ কথাই তাঁহারা বলিয়া থাকেন। মন বল, বুদ্ধি বল, আত্মা বল, সকলই ঐরূপে উৎপন্ন। আর এক শ্রেণী বলেন, জড় এবং চৈতন্যভেদে শক্তি দুই প্রকার। এই দ্বিবিধ শক্তি খেলাতেই উভয় জগৎ প্রসূত। সূক্ষ্মা চৈতন্যশক্তি স্থূলা জড়া ভগিনীকে সর্ব্বদাই আত্মবশে রাখিয়া নিয়মন করিতেছেন।

পাশ্চাত্যের বিরল দুই চারি ব্যক্তির শক্তিসম্বন্ধীয় জ্ঞানই ভারতের ঋষিদের জ্ঞানের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে। তাহাও অনুমান-সহায়ে, ঋষিদের ন্যায় অনুভূতির ফলে নহে। নতুবা ইউরোপ ও আমেরিকা অল্পদিন মাত্র চার্ব্বাক-মত হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছে। যুদ্ধ-

বিগ্রহে ধনাগমকৌশলে, বহুব্যক্তির একত্র সংস্থানে ও একোদ্দেশ্যে নিয়মনে, ভৌতিক শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তারে, বৈশ্য এবং এতকাল ঘৃণ্য বলিয়া পরিগণিত শূদ্রের অন্তর্নিহিত শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশে, শিক্ষার স্থল হইলেও মানসিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের উচ্চাঙ্গের শক্তিবিকাশে উক্ত উভয় দেশের আধিপত্য এখনও প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেখানে ভারতের ঋষির "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"— বিষয়াসক্ত ব্যক্তির যেখানে অন্ধকার, সংযমীর সেখানেই আলোক-বোধ—সেই পুরাতন কথা এখনও সত্য! ভারতের ঋষিদেরই সেখানে এখনও পূর্ব্বাধিপত্য অক্ষুণ্ণ! তাই ভারতের বেদবেদান্তের গম্ভীর ধ্বনিতে এখনও পাশ্চাত্য জগৎ মোহিত, স্তব্ধ।

শক্তি জড়স্বরূপা, এ কথা নূতন নহে। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কপিলাদি ঋষিগণ একথা প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের জড়বাদে এবং আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের জড়বাদে অনেক প্রভেদ বিদ্যমান। যে শক্তি কার্য্যাকার্য্য-বিচারক্ষম মানববুদ্ধি প্রসব করিয়াছেন, তিনি যে তদপেক্ষা অধম, এ কথা ঋষিদের স্বপ্নেরও অগোচর। কার্য্য কি কারণাপেক্ষা

কখন গুরু হইতে পারে? যাহা কারণে বর্ত্তমান, তাহাই কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে ও প্রকাশ পায়—একথা ঋষিগণ কেন, সর্ব্ববাদিসম্মত।

ভারতের ঋষি শক্তির স্বাধীন কার্য্যকারিতার অভাব স্বীকার করিলেও চৈতন্যময় পুরুষের সহিত নিত্যসংযোগে তাঁহাকে নিত্য-চৈতন্যময়ী দেখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কল্পনাসহায়ে পৃথক করা ভিন্ন শক্তি ও শক্তিমানকে বাস্তব পৃথক করা কি কখন সম্ভবে? অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তিকে কেহ কখন পৃথক করিয়াছে বা দেখিয়াছে কি? বহুর ভিতর একের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতের ঋষি দ্বৈতাদ্বৈতবর্জ্জিত পরমধামে উপনীত হইয়াছিলেন। বাহ্য ও আন্তর জগৎ একই শক্তিপ্রসূত বলিয়া অনুভব করিয়া, পরিশেষে সেই শক্তিকেও শক্তিমানের সহিত নিত্যযুক্ত দেখিয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্"—(চণ্ডী)

"মম যোনি রপ্‌স্বন্তঃ সমুদ্রে"—(দেবী সূক্ত)

"দেবী নিত্যস্বরূপা, জগৎই তাঁহার মূর্ত্তি, তিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন।" "যাহা হইতে জীব, জগৎ প্রভৃতি সমস্ত নির্গত হইতেছে, সকলের

উৎপত্তির কারণস্বরূপিণী আমিই তাহা—পরমব্রহ্মে নিত্য বিদ্যমান।” সেই জন্যই দেবগণ শক্তির স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

“যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥”

“যিনি সর্ব্বভূতে চেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার পদে বার বার প্রণাম।”

চৈতন্যের সহিত শক্তির নিত্য মিলন সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিয়াই বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী পদার্থে এবং সমগ্র জগতে ভারতের ঋষিগণ শবশিবার আরাধনা করিয়াছিলেন। অভ্রভেদী পর্ব্বতমালা, সাগর বাহিনী নদনদী, ঊষার রক্তিম ছটা, সন্ধ্যার তিমিরাবগুণ্ঠন—সকলই তাঁহাদের নিকট সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী দেবীর প্রতীকস্বরূপ হইয়া তাঁহার সৌম্যাৎসৌম্যতরা মূর্ত্তি প্রকাশ করিত। অমানিশার সূচীভেদ্য অন্ধকার, মৃত্যুর নিষ্ঠুর ছবি, শ্মশানের কঠোর উদাসীনতা, কালের সংহার-ছায়া—সকলই আবার সেই করালবদনার ভিতর কোমল-কঠোর ভাবের এককালীন একত্র সমাবেশ নয়নগোচর করাইয়া তাঁহাদিগকে মোহিত করিত। দেবাসুরের নিত্যসংগ্রামস্থল মনুষ্যমনে আবার দেবীর

বিশেষ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা বিশেষ আরাধনা বিধান করিয়াছিলেন। পথপ্রদর্শক গুরুর ভিতর, জগদ্বিমোহিনী স্ত্রীমূর্ত্তির ভিতর, বিদ্যা, ক্ষমা, শান্তি, মোহ, নিদ্রা, ভ্রান্তি-প্রভৃতি সাত্বিক এবং তামসিক গুণের ভিতর সংসারে বিশেষ-গুণশালী প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির ভিতর সেই অদ্বিতীয়া বরাভয়করা মুণ্ডমালিনী দেবীর আবির্ভাব দর্শনে এবং শ্রদ্ধার সহিত আরাধনে তাঁহারা আপনারা কৃতার্থ হইয়া মানবকে সেই পথে চলিয়া ধন্য হইতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কোন্ কোন্ স্থানে শক্তির কি কি বিশেষ প্রকাশ এবং কাহারই বা কি ভাবে পূজাবিধান, সে সমস্ত অনেক কথা, অতঃপর আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এখন উপসংহারে কেবল ইহাই বলি যে—ভারতের কুলদেবী 'দুঃস্বপ্ননাশিনী' শিবানীর উপাসনায় পূর্ণভাবে আত্মবলিদানের জ্বলন্ত মহিমা যদি দেখিতে, অনুভব করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এস, হে পাঠক, একবার নিমীলিতনেত্রে ধ্যানসহায়ে সেই দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলে, সেই কুটীরনিবাসী শক্তিসেবায় আত্মহারা দেবমানব প্রেমিকের পদপ্রান্তে—যাঁহার নিকটে জ্বলন্ত দীক্ষালাভেই শ্রীবিবেকানন্দ আজ সুদূর

ইউরোপ ও মার্কিনে চিরপদদলিত হিন্দুর ধর্ম্মধ্বজা সগৌরবে উড্ডীন করিয়াছেন—তীর্থাস্পদ তাঁহারই পদপ্রান্তে এস ক্ষণেকের জন্য দণ্ডায়মান হই।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

অবতারতত্ত্ব ও গুরুপ্রতীক

উপরে—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডগতিসমাচ্ছন্ন শ্যামল আকাশ; নীচে—শস্যশ্যামলা বসুন্ধরাবক্ষে শ্যামল অচল-মালার কৃষ্ণনীরদাবৃত শৃঙ্গাবলী ও তৎপদপ্রান্তে চির-চঞ্চল শ্যামল জলধির বীচিবিক্ষোভময় প্রলয়তাণ্ডব!—হে শ্যামা! বিরাট স্থূল শরীরে তোমার এ স্থূলভাবের খেলা!

বাহিরে—ক্ষুদ্রায়তন, ক্ষণভঙ্গুর, রোগাদির নিত্য আশ্রয়, নিশ্চিতমৃত্যু কিন্তু অনিশ্চিত-তৎকাল, নগণ্য মনুষ্যশরীর; ভিতরে—দেশকালব্যবধান-উল্লঙ্ঘন প্রয়াসী, সর্ব্ববিধরহস্যভেদনতৎপর, হঠকারিতায় জগৎকর্ত্তারও স্বভাব নিরূপণে অগ্রসর, কার্য্য-মাত্রানুমেয়, ইন্দ্রিয়াতীত মনুষ্যমন।—হে দেবি! সূক্ষ্ম শরীরে সূক্ষ্মভাবে তোমার এ অধিকতর বিচিত্র লীলা!

সম্মুখে—রূপরসাদির অনন্তহাবভাবযুক্ত অগণন-মোহনশ্রী এবং নানাচিন্তাকার্য্যসমাকুল, আত্মবিস্মৃত, রহিতাবসর-হিতাহিতদৃষ্টি, উন্মাদ মন ও ইন্দ্রিয়গ্রামের তদালিঙ্গনে উন্মাদচেষ্টা; পশ্চাতে—ইচ্ছামাত্র-সহায়, কেন্দ্রীভূতশক্তি, অচল, অটল, সাক্ষিবৎ সমাসীন, অপরোক্ষ আত্মা—হে মায়ে! কারণরূপিণি! তোমার এ সর্ব্বোৎকৃষ্ট অপূর্ব্ব লীলাবিলাস!

আবার, মন বুদ্ধির অতীত, "স্তিমিতসলিলরাশি-প্রখ্যমাখ্যাবিহীন" "বিগতভেদাভেদ শমিতসর্ব্বনামরূপ" তোমার যে অবস্থা, যাহার মহিমা ভারতের ঋষিকুল এক প্রাণে একবাক্যে বর্ণনায় এবং মানব-সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য করিয়া চিরশান্তিদানের চেষ্টায় নিরন্তর ব্যস্ত—হে অম্বে, শক্তিরূপিণি! উহাই কি তোমার নিত্যা মূর্ত্তি? সাধারণ মানব কি বলিতে পারে? স্তব্ধীভূতবাসনা-জাল, মনবুদ্ধির পারে অবস্থিত, তোমার বরপুত্র, জগদ্‌গুরু, মহাপুরুষ, ঈশ্বরাবতারেরাই সে কথা বলিতে পারেন।

কতকাল ধরিয়া ভারত তোমার জগদ্‌গুরু-মূর্ত্তির পূজা করিল—কবে ঐ পূজার প্রথমারম্ভ? তোমার ঐ অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তির দর্শনলাভে মানব ঋষিত্ব, দেবত্ব প্রাপ্ত

হইয়া সমগ্র মানবকুল ধন্য করে, এ কথা দেশের জনসাধারণ কবে হৃদয়ঙ্গম করিল ? কে শিখাইল ?

সহস্রারপঙ্কজ তোমার কৃপায় ভারতেই প্রথম সগৌরবে বিকশিত হইল—তৃষিত ভ্রমরকুলও তৎসকাশে আপনি আসিয়া জুটিল এবং মোহিত হইয়া নিজ নিজ মন প্রাণ উৎসর্গ করিল—শ্রীগুরুমূর্ত্তিতে তোমার পূজা জনসাধারণে এই ভাবেই প্রথম করিতে শিখিল !

মানবে শক্তিপূজা—মানবে মনুষ্যত্বের সহিত তোমার অভূতপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া হৃদয়ের সরস কোমল পবিত্র ভাবসমূহ তৎপদে ঢালিয়া দেওয়া, তোমার সহিত তাহাকে চিরমিলিত দেখিয়া, তোমার সহিত তাহার একত্ব অনুভব করিয়া, তাহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, পরব্রহ্মাদি নামে অভিহিত করা—একটা ঢং করিয়া, দশজনে পরামর্শ করিয়া করা নহে—হৃদয়ের পূর্ণতায়, প্রাণের উল্লাসে, 'মন মুখ এক' করিয়া সত্য সত্যই সর্ব্বকাল করা !—এই রূপেই কি গুরুবাদ ধীরে ধীরে ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইল ?

মন-বুদ্ধির পারগত মানবে মন-বুদ্ধি-কল্পনাতীত শক্তির প্রকাশ। ভাবনাতীত ভাবে তুমি তথায় প্রকাশিতা ! কাম-কাঞ্চনের খরস্রোতে বিষয়-সমুদ্রা-

ভিমুখে দ্রুত ভাসমান জগতে ঐরূপ মানবই কেবল নিত্যহিমাচলনিবদ্ধদৃষ্টি, বিপরীতগমন-সামর্থ্যবান্!—কেনই বা মানবসাধারণ তাঁহার পূজা না করিবে?

নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থচিন্তামগ্ন আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত প্রাণীসমূহের মধ্যে তিনিই কেবল লব্ধকাম হইয়া পরহিতানুধ্যানমগ্ন!—তাহাও আবার কোনরূপ প্রত্যাশায় নহে! জগৎ ত কতবার নিজ কল্যাণ না বুঝিয়া তাঁহাদের উপর কত অনাচার অত্যাচার বিসদৃশ ব্যবহার করিয়াছে; ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। তাঁহারাও অম্লানবদনে অক্ষুণ্ণমনে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করিতে করিতে বিন্দু বিন্দু রুধিরপাত সহ্য করিয়াছেন—মরিয়াছেন—অস্থিতে অমোঘ বজ্রের সৃজন হইয়া জগতের জনসাধারণেরই রক্ষণ ও কল্যাণ সাধিত হইয়াছে! হে অহেতুকদয়ানিধে গুরো! তুমি মরিয়াও অমর, সচল, জীবন্ত, ঘনীভূত শক্তিপ্রতিমা; জগৎ কেনই বা তোমার পদে স্বেচ্ছায় লুণ্ঠিত না হইবে! কেনই বা তোমায় 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ' ইত্যাদি বাক্যে স্তব না করিবে!

ভারত বুঝিয়াছে, গুরু মনুষ্য নহেন; মনুষ্যমূর্ত্তিতে বিদ্যারূপিণী তুমি!—মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া আকার

ও মূর্ত্তিবিশেষ আশ্রয় করিয়া মানবের শিক্ষার্থে, হিতার্থে, মহদ্ভয়বিনাশার্থে করুণায় প্রকাশিতা! আর মানুষী মূর্ত্তিতে তোমার ঐরূপে কেন্দ্রীভূত হওয়া?—উহাও তোমার নানা লীলাবিলাসের মধ্যগত এক অপূর্ব্ব লীলা-ভঙ্গ।

কোথায়, কি নিয়মে ঐ মহাশক্তিকেন্দ্রসমূহ সমুদ্ভূত হয়? উহাদের আবির্ভাবসময়ে দেশের পূর্ব্বাপর অবস্থাই বা কিরূপ হইয়া থাকে?

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেন,—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥"

—গীতা।

নিদাঘে পুঞ্জীভূত আতপতাপ বায়ুস্তরের তরলতা-সম্পাদন এবং সহসা প্রসার আনয়ন করিয়া যেমন হঠাৎ প্রবল বাত্যার সৃজন করিয়া থাকে, অজ্ঞান-প্রসূত পুঞ্জিভূত অনাচার, অধর্ম্ম, মানবের অন্তর্জ্জগতে ঐরূপ আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া মহাশক্তির কেন্দ্রীভূত প্রকাশের অবসর করিয়া দেয়। তখন মানুষের মনে ভাবের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া তাণ্ডবতরঙ্গে বিপরীত গতিতে ধাবিত হইয়া থাকে। মানবমনের সঙ্কীর্ণ বাঁধসমূহ চূর্ণ

বিচূর্ণ হইয়া যায় ; কোথাও বা ভাবস্রোতে চিরনিমজ্জিত হইয়া জলধিতলগত আটলাণ্টা দ্বীপের ন্যায় অন্ধতমসাবৃত হয় ! সেই জন্যই কি মনুষ্যমনের কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ ভাবরাশির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা ইহসংসারে গুরু সাজিয়া দোকান পাট খুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন, যথার্থ গুরুরূপী কেন্দ্রীভূত শক্তিবিকাশের সময় যুগে যুগে তাঁহাদের মহদ্ভয় আসিয়া উপস্থিত হয় ?—জগতের 'দশকর্ম্মান্বিত' ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, শিষ্যব্যবসায়ী গুরুকুল সাবধান—আবার বর্ত্তমান যুগে কেন্দ্রীভূত গুরুশক্তি প্রকাশিত হইয়া মানবমনের সঙ্কীর্ণতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতেছে ! নূতন তরঙ্গে দেশ কোথায় কতদূরে ভাসিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে ? ধর্ম্মভাণী দুনিয়াদার, তোমাদের দুর্দ্দশা কতদূর গড়াইবে, তাহাই বা কে বলিবে ?

মনের ভাবই কার্য্যপরিণামে স্থূল আকার ধারণ করে। উহা ব্যক্তিতে যেমন, জাতিতেও ঠিক তেমনি। আবার ব্যক্তির সমষ্টি সমাজ-সকলের আবাসস্থল দেশ, পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেও ঠিক তদ্রূপ।

যথার্থ গুরুশক্তির উদয়ে নূতন ভাব-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যসমাজে কতই না পরিবর্ত্তন সমুপস্থিত হয়।

তখন পরিবর্ত্তনমুখে অধিষ্ঠিতা থাকিয়া ভয়ঙ্করী ভীমা সর্ব্বত্র পর্য্যটন করেন এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সাদরে পোষিত মানবমনের সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি মথিত ও বিধ্বস্ত করিয়া দেন! তখন বিপরীত ভাবস্রোতে পড়িয়া কর্ত্তব্য লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় একমত হয় না—স্বামী স্ত্রী বিপরীতমতাবলম্বী—পিতা পুত্র পরস্পরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়।*

অজ্ঞানের সহিত জ্ঞানের সংগ্রাম! যুগে যুগে আবহমানকাল ধরিয়া ব্যক্তির ভিতর, জাতির ভিতর, সমাজের ভিতর, দেশের ভিতর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভিতর, কতভাবে, কতরূপে, কতই না হইল ও হইতেছে! ইহাই কি শাস্ত্রকথিত দেবাসুরের দ্বন্দ্ব? কোনও কালে কি ইহার বিরাম হইবে? কোনও কালে কি জগৎ, সত্য, ন্যায় এবং জ্ঞানকে সম্মুখে রাখিয়া প্রত্যেক চিন্তা, বাক্য ও কার্য্য করিবে?—যাঁহার জগৎ, তিনিই বলিতে পারেন! কিন্তু হে ভীরু! এ সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইও না। হইয়াই বা করিবে কি? ভিতরে বাহিরে যেখানে চাহ, দেখ ঐ সংগ্রাম। আত্মহিত চাও, উহা করিতে হইবে; পরহিত চাও, উহাই;

* Mathew X 34—36.

নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চাও, উহা না করিলে যথার্থ বিশ্রাম লাভ হইবে না। তবে উঠ, জাগ, কোমর বাঁধ, শক্তিরূপিণী তোমার সহায় হইবেন।

অন্য দেশে মা শত হস্তে ধনধান্য ঢালিয়া দিতেছেন। দেখিয়া ঈর্ষায় তোমার অন্তস্তল জ্বলিয়া উঠে! তাহাদের হৃষ্টপুষ্ট সন্তান-সকলের প্রফুল্ল মুখকমলের সহিত ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ, আচ্ছাদনবিরহিত, রোগে জর্জ্জরিত, তোমার সন্তানসকলের তুলনা করিয়া তুমি জগদম্বাকেই শত দোষে দোষী কর! অন্যের পদাঘাতপীড়িত হইয়া তুমি অদৃষ্টকে শতবার ধিক্কার দিতে থাক—কিন্তু দোষ কার? দেখিতেছ না, তাহারা অজ্ঞানসমরে সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াই বড় হইয়াছে—আর তুমি সহস্র বৎসরের অজ্ঞানকে হৃদয়ে অতি যত্নে পোষণ করিয়া নীরব, নিশ্চিন্ত আছ! উহারা বিদ্যারূপিণী শক্তির পূজায় অদম্য উৎসাহে অশেষ কষ্ট সহিয়াছে, অজস্র হৃদয়ের রুধির ব্যয় করিয়াছে, দশের কল্যাণের জন্য আত্মবলি দিয়া দেবীকে প্রসন্না করিয়াছে—আর তুমি অবিদ্যাসেবায় যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থসুখ লইয়া বসিয়া আছ! জগন্মাতা তোমায় দিবেন কেন? শাস্ত্র যে তোমায় বার বার বলিতেছেন, তিনি বলিপ্রিয়া,

রুধিরপ্রিয়া। দেবীর ঐ ভাব যে তাঁহার ধ্যানমন্ত্রেই রহিয়াছে। ঐ শুন, ভারতের তন্ত্রকার তোমায় কি ভাবে শক্তির ধ্যান করিতে বলিতেছেন—

"শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্।
হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্॥
মুক্তকেশীং লোলজ্জিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ।
চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥"

প্রতি কার্য্যে মহাশ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া স্বার্থসুখত্যাগে আত্মবলিদানে তাঁহার তর্পণ কর, তাঁহাকে প্রসন্ন কর, দেখিবে, শক্তিরূপিণী জগদম্বা তোমারও প্রতি পুনরায় ফিরিয়া চাহিবেন!—তোমার নয়নে দীপ্তি, বাহুতে বল, হৃদয়ে তেজ, অন্তরে অদম্য উৎসাহরূপে প্রকাশিত হইবেন! দেখিবে, জগন্মাতার নিত্য সহচরীদল—বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা প্রভৃতি—আবার তোমার উপর প্রসন্না হইয়া প্রতি কার্য্যে তোমার সহায়তা করিবেন।

এক একটি নূতনভাব গ্রহণ করিতে আমাদের কতই না দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। ব্যবহারিক জগতে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীভাব লইয়া ফ্রান্সের বিপ্লবের কথা এবং অধুনাতন জাপান-যুদ্ধের

কথাই দৃষ্টান্তরূপে ভাবিয়া দেখ না। ব্যবহারিক, রাজনৈতিক জগতে যদ্রূপ, আধ্যাত্মিক জগতেও ঐ বিষয়ে ঠিক তদ্রূপ! সেইজন্যই কি গুরুরূপী মহাশক্তি প্রকাশে ধর্ম্মবিপ্লবের কথা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ? কিন্তু প্রবল ঝটিকার পরেই প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করে, কার্য্যের পরই বিরামের স্বভাবতঃ উদয় হয় এবং ঐ প্রকার বিপ্লবের পরেই শান্তি ও জ্ঞান মনুষ্যসমাজে দৃঢ়তর অধিকার স্থাপন করিয়া বসে।

গুরুরূপী শক্তির উদয়ে যে আধ্যাত্মিক জগতে ভাববিপ্লব সংঘটিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। তবে ঐ ভাববিপ্লব যে ধীরপদসঞ্চারে দেশময়, সমাজময়, কখনও অধিকার স্থাপন করিতে পারে না, তাহাও নহে। ঝঞ্ঝাতাড়িত বজ্রবিলোড়িত বিচ্ছিন্নবক্ষ জলধিজলে স্ফীতি ও তরঙ্গের প্রসার—উহা এক ভাব। আর চন্দ্রোদয়ে স্নিগ্ধ কিরণবিপ্লাবিত সমুদ্রবক্ষের উল্লাস ও স্ফীতি—উহা আর এক ভাব। অমিতাভ বুদ্ধ, জ্ঞানগুরু শঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির উদয়কালের কথা তুলনায় স্মরণ কর - তাহা হইলেই ঐ কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

অবতার জগদ্গুরু—মনুষ্যরূপে ঈশ্বর! মনুষ্যত্বে ঈশ্বরত্বের অপূর্ব্ব মিলন—মানুষে অমানুষী দৈবী শক্তির

বিকাশ—শক্তিপ্রসূত সংসার-মহীরুহের ফুল্লবিকসিত পারিজাত। ঈশ্বর সংসারে সমগ্র শক্তির ব্যবহার, চালন ও যথার্থ ভাবে নিয়মন করেন, কিন্তু কখনও তাহার বশীভূত হইয়া আত্মবিস্মৃত, স্তব্ধ বা মূঢ় হইয়া তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিত্ব প্রাপ্ত হয়েন না! হে জগদ্‌গুরো! মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও তোমার জগৎকারণজ্ঞান এবং তৎসহিত নিজের একত্বজ্ঞানের কখনও লোপ হয় না! মায়ার ভিতরে থাকিলেও, তোমার তৃতীয় চক্ষু সর্ব্বদা অনাবৃত থাকিয়া মায়ার পারের বস্তু নিরীক্ষণ করিতে থাকে! আর, মনুষ্য-সাধারণকে মোহিত করিয়া দাসভাবে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে যত প্রকার শব্দস্পর্শাদি, তাহারাও তাহাদের প্রভাব সহস্র চেষ্টাতেও তোমার উপর কখনও বিস্তার করিতে পারে না!—কেনই বা তোমায় নররূপে ঈশ্বর না বলিব?

অবতার—জগদ্‌গুরু—নররূপে ঈশ্বর! ঈশ্বর! সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বভাবে পূর্ণ—নিজের কোন অভাব না থাকায় তৎপরিপূরণের জন্য কোন চেষ্টারও তাঁহার প্রয়োজন নাই—অথচ জগতের যাবতীয় চেষ্টার মূলই তিনি। হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো! তোমারও

স্বরূপজ্ঞান সর্ব্বদা প্রকাশিত! অথচ নিজের কোন অভাব না থাকিলেও তুমি মনুষ্যসমাজের কল্যাণার্থ দিবারাত্র চেষ্টা করিয়া থাক। তোমার আহার বিহার, নিদ্রা, জাগরণ, চেষ্টা, বিরাম সংসার সন্ন্যাস প্রভৃতি সকলই অপরের জন্য!—কেনই বা তোমাকে মনুষ্যরূপে ভগবান্ না বলিব?

অবতার—জগদ্‌গুরু—মানুষী তনুতে ঐশী শক্তি? ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমার যেমন "ইতি" নাই, তোমারও তদ্রূপ! তোমা ভিন্ন আর কে পূর্ব্বসংস্কার দৃঢ় পাষাণসদৃশ মনুষ্যমনকে ইচ্ছামাত্রে গলাইয়া নিজের ছাঁচে ঢালিয়া নূতন সত্যধারণোপযোগী গঠন দিতে পারে? কেই বা শরীরস্পর্শমাত্রেই অহংগ্রন্থি শিথিল করিয়া মানুষকে কামকাঞ্চনাতীত ভাব ও সমাধি-রাজ্যে বিচরণ করাইতে পারে? কেই বা "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" রূপ পরমধামে উপনীত হইবার নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট অধিকারীর নিকট তল্লাভ সুগম করিয়া দিতে পারে? কেই বা সকল ভাবের সমান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাদের চরম লক্ষ্য যে একই, একথা নিজ জীবনে প্রমাণিত করিতে পারে? কেই বা বিপরীত

ভাব ও বিপরীত মতসমূহের মধ্যে, "সূত্রে মণিগণা ইব"—সমন্বয়সূত্র প্রত্যক্ষ করাইয়া মনুষ্য-জ্ঞানের উদারতা সম্পন্ন করিয়া দিতে পারে? কেই বা বহুজনহিতায় যুগে যুগে স্বেচ্ছায় মানুষভাবাপন্ন হইয়া, অসীম উৎসাহে আদর্শের পর আদর্শসমূহ নিজ জীবনে পরিণত করিয়া মনুষ্যমনে তদনুরূপ অনুষ্ঠানের সাহস ও বলের উদ্দীপন করিয়া দিতে পারে?

হে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, অপারমহিম, কেন্দ্রীভূত-বিদ্যারূপ আত্মারাম গুরো! তোমার কৃপায় ভারত সর্ব্বকাল পুণ্যক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র, জ্ঞানবীর্য্যের আকরভূমি! তোমাকে ভুলিয়াই ভারতের এ দুঃখ, দারিদ্র্য অজ্ঞান! সে ভুলিলেও তুমি তাহাকে ভুলিয়া থাকিও না। গুপ্তভাবে * উদিত হইয়া ভারতের এবং তদ্দ্বারা সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য যে অমোঘ জ্ঞান ও ভক্তিবীজ রোপণ করিয়া গিয়াছ, যাহার কিছুমাত্র পাশ্চাত্যে পড়িয়া তথায় অপূর্ব্ব ভাববিপ্লব সম্পন্ন করিতেছে, হে দেব! হে দয়ানিধে! উহা যাহাতে ভারতে ফলফুলে সমাচ্ছন্ন মহাবৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া প্রত্যেক

---

* শ্রীরামকৃষ্ণের আপন অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর নিকট আপন অবতারত্বের কথায় বলিতেন—"রাজা যেমন প্রজাদের অবস্থা জানবার জন্য ছদ্মবেশে সহর দেখতে বেরোয়, এবার সেই রকম জানবি।"

নরনারীর প্রাণে বল, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়াদিরূপ ছায়া বিতরণ করিয়া আমাদের আধ্যাত্মিক দুর্দ্দশা ও সংসারতাপের অবসান করে, তাহাই কর—তাহাই কর!

আর তুমি হে শ্রদ্ধাসম্পন্ন শ্রোতা! তুমিও ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বীরেশ্বর * শ্রীবিবেকানন্দ প্রচারিত মহাসত্যসকল যত্নে হৃদয়ে ধারণ করিয়া সেই অপারমহিম অপ্রতিহতপ্রভাব গুরুশক্তির কথা ভারতের ঘরে ঘরে প্রচারে দৃঢ়বদ্ধপরিকর হইয়া "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"-রূপ অভয়বাণী উচ্চারণে সকলের প্রাণে আশার সঞ্চার কর! নবযুগে তোমাতে নবশক্তি সঞ্চারিত হউক—প্রকাশিত হউক!

---

* স্বামী বিবেকানন্দের পিতামাতা-প্রদত্ত অন্যতম নাম।

তৃতীয় প্রস্তাব

শক্তিপ্রতীক—অবতার, গুরু, সিদ্ধপুরুষ, মন্ত্রদাতা, উপগুরু ও শিক্ষক

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, "গাছ পাথর নিয়ে ভগবানের বিশেষ লীলার প্রকাশ নয়, কিন্তু মানুষের মনই তাঁর বিশেষ লীলার স্থান।" আবার বলিতেন—"যদি মানুষ না থাক্‌ত, ভক্ত না থাক্‌ত ত ভগবানকে পুঁছত কে—জান্‌ত কে—তাঁর অপার শক্তি, মহিমার কথা বেদবেদান্ত লিখে প্রচার কর্‌ত কে? ভক্ত আছে, তাই ভগবান আছে।" আবার বলিতেন—"ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক, একে তিন।"

বিশেষ শক্তিমৎ পদার্থনিচয় বা শক্তিপ্রতীকসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমেই মানবে শক্তিপূজার অবতারণা করিয়াছি। ইহাতে কেহ যেন না অনুমান করেন যে, মানবের ভিতরেই বুঝি মানব প্রথম বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইয়া তদুপাসনায় নিযুক্ত

হয়—গুরুপূজাই বুঝি সে সর্ব্বাগ্রে করিতে শিখিয়াছিল। মানবপ্রকৃতির ইতিহাস বলে—আমরা অত সহজে সরল পথে চলি না; অতি সন্নিকট পদার্থই আমাদের অতিদূরে বর্ত্তমান; নিজের ঘর না সামলাইয়া—আগেই পরের ঘর সামলাইতে অগ্রসর হওয়া আমাদের স্বতঃসিদ্ধ জাতীয় স্বভাব! নতুবা যথার্থ জ্ঞান ও সভ্যতা এতদিন জগতে অনেক দূর অগ্রসর হইত!

মানবে প্রকাশ্যভাবে শক্তিপূজা জগৎ অল্পকালই করিতে শিখিয়াছে। ভারতেই ঐ পূজার প্রথম অভ্যুদয় এবং ভারত হইতেই জগতে ঐ পূজার প্রথম প্রচার। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"ভারত হইতেই প্রবল ধর্ম্মতরঙ্গ কালে কালে উত্থিত হইয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে এবং পরেও চিরকাল হইতে থাকিবে।" বৈদিক যুগ হইতেই উহার আভাস পাওয়া যায়; বৌদ্ধযুগের কথা ত নিঃসন্দেহ প্রমাণিত, এবং বর্ত্তমান যুগের বেদান্ত প্রচার আবার, আমাদের চক্ষুসমক্ষেই অভিনীত! ইতিহাস যেখানেই কালের অন্ধকার ভেদে সমর্থ হইয়াছে এবং হইতেছে, সেখানেই স্বামিজীর ঐ কথা প্রমাণিত হইতেছে।

ভারতেই গুরুরূপী ঐশী শক্তির মানবে প্রথম

বিকাশ।—ব্রহ্মজ্ঞ বৈদিক ঋষিকুলই তাহার প্রমাণ। অবতাররূপী মহাশক্তিকেন্দ্র ভারতেই প্রথম উদিত হইয়া জগতে মহাবিপ্লব আনয়ন এবং সভ্যতা ও জ্ঞানালোক বিকিরণ করিয়াছিল—ভগবান্ বুদ্ধ ও তাঁহার পরবর্ত্তী প্রচারকগণের কার্য্যেই উহা প্রমাণিত। নাগার্জ্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ প্রচারকগণের তাতার, চীন ও জাপানাধিকার—মহারাজ ধর্ম্মাশোকের ইজিপ্ট, আসিয়ামাইনর, পারস্য প্রভৃতি দেশে প্রচারক প্রেরণ এবং এখনও বিদ্যমান শাসনস্তম্ভরাজির কথা স্মরণ কর। বহুকালাভ্যস্ত শ্রীগুরুর পূজা এখন ভারতের মজ্জাগত প্রাণ।

অবতার, আধ্যাত্মিক রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্, সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের লোকগুরু, কালে কালে অনেক হইলেও একই ব্যক্তি, কখনও গুপ্ত কখনও ব্যক্তভাবে উদিত হইয়া চিরকাল জনকল্যাণে রত!

ঐশী সম্পূর্ণতা এবং মানুষী দুর্ব্বলতার অপরূপ মিলন ভূমি—তাঁহার শরীর ও মন! স্থূলবুদ্ধি মানবমনে বিপরীত ধর্ম্মভাবের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া পুরাণকার হরিহর, অর্দ্ধনারীশ্বরাদি অপূর্ব্ব দেবমূর্ত্তি-সকলের কল্পনা করিয়াছেন—বিপরীত ধর্ম্মশীল অপূর্ব্ব অবতারবিগ্রহই কি তাঁহার সে কল্পনার মূলে?

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥—গীতা।

অবতাররূপী গুরুকে সম্যক জানিতে ও চিনিতে কে সমর্থ? তিনি সর্ব্বকালেই পরমাত্মার ন্যায় "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—যাহার নিকটে ইচ্ছা, কৃপায় স্বস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন! তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ তাঁহারই শ্রমুখাৎ শুনিয়া শ্রুতি-স্মৃত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যতটুকু লিপিবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহারই সংক্ষেপ মর্ম্ম আমরা নিম্নে প্রদান করিয়া জগদ্‌গুরু অবতারপুরুষে শক্তিপূজার কথা সমাপন করিব।

প্রথম। কে তিনি, পূর্ব্বে কি ছিলেন, এ জন্মে মনুষ্যশরীর পরিগ্রহ করিয়া তাঁহার আগমনকারণই বা কি?—ইত্যাদি জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি অবতারপুরুষে আশৈশব অল্পাধিক বর্ত্তমান থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে ঐ জ্ঞানের সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বিকাশ ছিল,—একথা ভারতের ধর্ম্মেতিহাস-প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয়। অভাব বোধই আমাদের যাবতীয় চেষ্টার মূলে এবং তদভাব পূরণ না হইলেই দুঃখ। নিজের অভাব বোধ না থাকায়, অপরের অভাব বোধ হইতে অথবা অপরের অভাববিশেষ দূর করিতেই অবতারপুরুষে

সমস্ত চেষ্টার আবির্ভাব হয়। সে একাঙ্গী চেষ্টার অমিতবেগ পুরুষসাধারণের অভাববোধপ্রসূত চেষ্টাতেও কদাপি লক্ষিত হয় না। আজীবন নিংস্বার্থ চেষ্টা করিতে একমাত্র তাঁহারাই সমর্থ।

তৃতীয়। মনোরাজ্যে তাঁহাদের একাধিপত্য। আপন মনের উপর যদ্রূপ, অপরের মনের উপরেও তদ্রূপ। অপরের মনের কর্ম্মসঞ্চিত পূর্ব্বসংস্কারসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া স্বল্পকালেই নূতনভাবে নূতনাদর্শে গড়িতে তাঁহারাই সমর্থ। শরীরস্পর্শমাত্রেই অপরের মনে আমূল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া সমাধিস্থ করা বা ভাববিশেষ উপলব্ধি করানর কথা তাঁহাদের সম্বন্ধে সর্ব্ব জাতির ধর্ম্মেতিহাসেই বিদ্যমান।

চতুর্থ। পরমাত্মার প্রত্যক্ষীকরণের নূতন পথবিশেষ আবিষ্কার করা, অথবা জনসমাজে পূর্ব্ববিদিত পথ বা ধর্ম্ম-সমূহের ভিতর নূতন সম্বন্ধসূত্রাবিষ্কার করা এবং ঐ ভাবের নূতনাদর্শ নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়া জনসমাজে প্রবর্ত্তিত করা তাঁহারাই সনাতনকাল হইতে করিয়া আসিতেছেন।

পঞ্চম। ধর্ম্মাদর্শ ভিন্ন, অবতারপুরুষের জীবনে তাৎকালিক সমাজের নৈতিকাদর্শও স্বভাবতঃই সম্পূর্ণ পরিস্ফূট থাকে। নৈতিকাদর্শ ধর্ম্মাদর্শ হইতে সম্পূর্ণ

বিভিন্ন এবং সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে ভিন্নাকার ধারণ করে—এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই আমরা অনেক সময়ে সকল অবতারপুরুষের জীবনই একরূপ নৈতিকাদর্শে গঠিত দেখিবার প্রত্যাশা করিয়া থাকি এবং তাঁহাদের অলোকসামান্য চরিত্র ঐরূপে তুলনায় পাঠ করিতে যাইয়া ভ্রমে পতিত হই।

ষষ্ঠ। অবতার মুক্তকণ্ঠে জনসাধারণকে বলিয়া যান, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"—"Come unto Me all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest"*—"হে ত্রিতাপাবসন্ন জীবগণ,আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমাদের শান্তি দিব"—এবং তিনি যে লোকগুরু, ঈশ্বরাবতার—এ কথা প্রাণে প্রাণে স্বয়ং অনুভব করেন ও অপরকেও নিজ শক্তিবলে তদ্রূপ অনুভব করাইয়া থাকেন।

অবতারপুরুষের সময়ে সময়ে গুপ্তভাবে আবির্ভাবের কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ সম্বন্ধে বলিতেন—"যেমন রাজা সেজেগুজে লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রকাশ্যভাবে ঢ্যাঁড়াপিটে নগর দেখ্‌তে বেরোন্, আবার কখন ছদ্মবেশে প্রজাদের অবস্থা ও

* Mathew X I.—28

কার্য্যকলাপ দেখ্‌বার জন্য বেরোন্‌ এবং যেই প্রজারা টের পেয়ে কানাকানি করতে থাকে—'ইনিই রাজা— ছদ্মবেশে আমাদের ভিতর এসেছেন'—অমনি সেখান হতে পালান্‌, সেইরূপ অবতারের ব্যক্ত এবং গুপ্ত আবির্ভাব জান্‌বি।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর একটি কথা অবতার সম্বন্ধে বলিতেন—যথা "অবতার পুরুষের কোনকালে মুক্তি নাই।" "যেমন সরকারি লোক, জমিদারীর যেখানে গোলযোগ উপস্থিত হবে সেখানেই তাকে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতে হবে এবং গোল থামাতে হবে, সেইরূপ ব্রহ্ম-ময়ীর জমীদারীর (জগতের) যেখানেই গোল উপস্থিত হবে সেখানেই অবতারপুরুষকে আবির্ভূত হয়ে লোকের দুঃখ মোচন করতে হবে।" এ কথায় কেহ যেন না অনুমান করেন যে, তবে বুঝি অবতারপুরুষকে চিরকালই মায়াধীন থাকিতে হয়। তিনি স্বভাবতঃই মায়াধীশ, আত্মারাম—কোন কালেই বদ্ধ হন না; অতএব তাঁহার মুক্তি কখন, কিরূপেই বা হইবে!

অবতারই আধ্যাত্মিক জগতে একমাত্র পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের পূজা জগৎ আবহমান কাল হইতে অবনতমস্তকে করিয়া আসিতেছে এবং চিরকালই

করিবে। তাঁহাদের মনুষ্যশরীরপরিগ্রহে সমগ্র মানবকুল ধন্য হইয়াছে। হে ভারত! যুগে যুগে তুমিই তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়া ধর্ম্মজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছ। তাঁহার সম্মান ও পূজা করিতে কখনও ভুলিও না।

ঈশ্বরাবতারের পূজা ভিন্ন আধ্যাত্মিক জগতে ভারত সিদ্ধপুরুষ, মন্ত্রদাতা কুলগুরু, এবং উপগুরু প্রভৃতিরও চিরকাল সম্মান এবং পূজা করিয়া আসিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধেও এখানে দুই চারিটি কথা বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধপুরুষ ঈশ্বরাবতারনির্দ্দিষ্ট পথবিশেষে অগ্রসর হইয়া পূর্ণকাম ও জীবন্মুক্ত হন। ঐকালে তাঁহাতেও আর স্বার্থচেষ্টা অসম্ভব হইয়া উঠে, কারণ যথার্থ ধর্ম্মানন্দলাভে তাঁহার—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"—গীতা

—ঐ প্রকার অবস্থা লাভ হইয়া পৃথিবীর যাবতীয় সুখদুঃখাদি অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইয়া যায়। অবতারপুরুষের ন্যায় শক্তির প্রকাশ না হইলেও তাঁহাতে গুরুশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া নিয়ত লোককল্যাণে নিযুক্তা থাকেন। ধর্ম্মজগতে নূতন পথাবিষ্কারে সমর্থ

না হইলেও তাঁহার দর্শনে কামকাঞ্চনৈকদৃষ্টি স্থূলদর্শী মানব ছায়াপ্রতিম ধর্ম্মাদর্শকে সচল, জীবন্ত বলিয়া অনুভব করিতে থাকে। ঈশ্বরাবতারের ন্যায় স্পর্শ বা ইচ্ছামাত্রেই ধর্ম্মজীবন দানে সমর্থ না হইলেও, তাঁহাদের অপরের ধর্ম্মজীবন উদ্দীপিত করিবার ইচ্ছা নিষ্ফল হয় না; এবং জাতিবিশেষের জীবনে এবং তন্মধ্য দিয়া অন্যান্য জাতির জীবনে উত্তাল তরঙ্গমালাসঙ্কুল ধর্ম্মবন্যা খরস্রোতে প্রবাহিত করিয়া অবতারপুরুষের ন্যায় অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সংসাধিত করিতে না পারিলেও, তাঁহারা আপন চতুষ্পার্শ্বস্থ জনসাধারণের মনে ধর্ম্মস্রোত প্রবাহিত করিয়া ধন্য করিয়া থাকেন। সিদ্ধাত্মা মন্ত্রাদি অবলম্বনে অপরে ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। অবতারের কথা ছাড়িয়া দিলে, ইহাদের ন্যায় অপর কোন মানবেই ধর্ম্মশক্তি সমধিক বিকশিত দেখা যায় না অবতার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক; সিদ্ধাত্মা তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে জীবন গঠন করিয়া সেই ধর্ম্মকে পুষ্ট রাখেন। ইহাদের পূজা করিলে, ইঁহাদের আদর্শে জীবন গঠন করিলে যে মানব ধন্য ও কৃতার্থ হইবে, এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

স্থূল চক্ষুর গোচর না হইলেও ধর্ম্ম জীবন্ত শক্তি! অনুষ্ঠানে উহার ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে এবং

অপরকে অনুভব করাইতে পারা যায়। বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন পুরুষ আপন শরীরমন হইতে ঐ শক্তি অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন এবং ঈশ্বর, আত্মা ও পরলোক-সম্বন্ধীয় যে সকল অনুভব জীবনে প্রত্যক্ষ করা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, সে সকলও অপরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করাইতে পারেন।—বহুকাল হইতে এসকল কথা প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।

আবার বহুকালব্যাপী চেষ্টা, ধ্যান ও একাগ্রতার দ্বারা ভাববিশেষ উপলব্ধি করিয়া, তাহাকে শব্দবিশেষের সহিত এমন সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করা যাইতে পারে যে, উহার উচ্চারণমাত্রেই ঐ ভাববিশেষ উজ্জ্বলবর্ণে অপরের মনে উদিত হইয়া তাহাকে অপূর্ব্ব অনুভব প্রত্যক্ষ করাইবে। এবং প্রত্যেক অনুভব যেমন ফলস্বরূপ আনন্দ বা দুঃখ প্রসব করিয়া মানবজীবন পরিবর্ত্তিত করে, ঐ বিচিত্রানুভবেও তদ্রূপ তাহার মন বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিশেষ আনন্দ বা দুঃখের অধিকারী হইবে। উহারই নাম মন্ত্রশক্তি। ঐ মন্ত্রশক্তির প্রভাবও ভারত বহুকাল হইতে অবগত হইয়া তদারাধনায় নিত্য নিরত আছে। শঠ-ধূর্ত্তের হস্তে সময়ে সময়ে প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও, উপযুক্ত গুরুসহায়ে ভারতে ঐ সকল

বিষয়, পুরাকালে এবং অধুনা, বহুবার পরীক্ষিত এবং সত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাসই মন্ত্রদাতা-গুরূপাসনার মূলে বর্ত্তমান।

অবতারপুরুষোচ্চারিত বাক্যসকলই যথার্থ মন্ত্র ও আশুফলপ্রদ; কারণ উহাতে তাঁহাদের বিশেষ শক্তি নিহিত থাকে। সহস্র বৎসর বা তদধিক কাল পরেও সে শক্তির স্বল্পাধিক পরিচয় পাওয়া যাইয়া থাকে। সিদ্ধপুরুষোচ্চারিত মন্ত্রও দ্বাদশ বৎসরের মধ্যেই ফল প্রত্যক্ষ করায়, ইহা লোক প্রসিদ্ধ। সাধুসাধকোচ্চারিত মন্ত্রের ফল উপলব্ধি করিতে তদপেক্ষাও অধিক কাল লাগে।

মন্ত্রফল উপলব্ধি করিতে কেবল যে উপযুক্ত গুরু আবশ্যক তাহা নহে। "আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো" ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন উপযুক্ত শিষ্যেই গুরুশক্তি সঞ্চারিত হইলে আশুফল প্রত্যক্ষ করাইয়া থাকে। সুফল লাভ করিতে এখানেও—উর্ব্বর জমি, উত্তম কর্ষণ, উত্তম বীজ এবং তদুপরি ঐ বীজের যত্নের সহিত সংরক্ষা এবং জলসেকাদির প্রয়োজন। বীজ উত্তম হইলেও যে অনেক সময় মন্ত্রফল প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার কারণ ঐ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

আমাদের জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বলিতেন, "নোঙ্গর ফেলিয়া দাঁড় টানিলে যেমন নৌকা কখন অগ্রসর হয় না, সেইরূপ ঐ সকলের অভাব হইলে ভগবচ্ছক্তি উপলব্ধিরূপ প্রত্যাশাও বিফল হয়।

মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস বিষয়াসক্ত মনের অনেক সময় অপকারেরও কারণ হইয়া থাকে। এক ব্যক্তির মন অপর ব্যক্তির মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে জানিয়া কামক্রোধান্ধ পুরুষ অনেক সময়ে নিজ স্বার্থতৃপ্তির আশয়ে ঐ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। অথবা দুর্ব্বল নীচচেতা পশুবৃত্তি মানব, আপন পাশব-প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য, পবিত্র গুরুনামের অযোগ্য, অপর নীচতর পুরুষের সহায়ে ঐ শক্তি প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ঐরূপ চেষ্টা কদাচিৎ সফল হইলেও ঐ দুর্ব্বৃত্তেরাই পরিণামে নানাবিধ দুঃখ, অশান্তি এবং মানসিক অবনতিরূপ দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে। তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক স্থলে পবিত্র ঐশী শক্তির আরাধনার বিশেষ বিধানের সঙ্গে সঙ্গে মারণ, উচাটন, বশীকরণাদির বিশেষ ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, পাশবপ্রকৃতি মানব উহা পরে বিশুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া ধর্ম্মের নামে

প্রবৃত্তির পৈশাচিক অভিনয় দেখাইয়া কলঙ্কিত করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনকালে ভারতে যে ঐপ্রকার দুর্ব্বৃত্তের সংখ্যা অধিক হইয়াছিল তাহাও ইতিহাস-প্রমাণিত। ঐ ধর্ম্মগ্লানি দূর করিবার জন্যই জ্ঞানগুরু শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের এবং ভক্তিপ্রাণ শ্রীচৈতন্যের ভারতে উদয়। তাঁহারাই পুনর্ব্বার শক্তি উপাসনার পবিত্রাদর্শ জনসাধারণে দেখাইয়া শিবোক্ত তন্ত্রশাস্ত্রের যথার্থ মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যলিখিত শিবদুর্গাদি-বিষয়িণী স্তবরাজি ও বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্য এবং শ্রীচৈতন্যের অন্নপূর্ণা দেবীকে আপন ইষ্টরূপে উপাসনাতেই উহা অবগত হওয়া যায়। অন্নপূর্ণা শ্রীশঙ্করেরও যে ইষ্টদেবী ছিলেন ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেব বলিতেন, "প্রত্যেক অবতারই সযত্নে শক্তির উপাসনা করিয়া গিয়াছেন। শক্তির বিশেষ অনুগ্রহলাভ না করিয়া কখনই লোকগুরুত্ব লাভ করিতে পারা যায় না, অথবা ধর্ম্মভাগীরথীর প্রবল তরঙ্গে দেশ আপ্লাবিত করিয়া জনসাধারণে যথার্থ ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারা যায় না" শ্রীচৈতন্যের বেদান্তভাব বা শক্তি উপাসনার কথা শুনা যায় না বলিয়া আপত্তি

উত্থাপিত হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব আমাদের বলিয়াছিলেন, "যেমন হাতীর দুই প্রকার দাঁত থাকে এক প্রকার বাহিরে, শত্রু আক্রমণ করিবার জন্য, এবং অপর প্রকার ভিতরে, খাইবার জন্য—শ্রীচৈতন্যেও সেইরূপ দুইপ্রকার ভাব ছিল। ভক্তি তাঁহার বাহিরের ভাব—সাধারণের নিকট প্রচারের জন্য ; এবং বেদান্ত ও শক্তি উপাসনা তাঁহার ভিতরের ভাব—উহা নিজের জন্য ; কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস্ গ্রহণ এবং অন্নপূর্ণা দেবীর উপাসনাতেই উহা বুঝা যায়।"

যে শক্তিরই উপাসনা কর, অতি পবিত্রভাবে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। স্বার্থানুসন্ধানের নাম গন্ধ পর্য্যন্ত মন হইতে দূরে রাখিতে হইবে। নতুবা উপাসনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং অনেক সময়ে বিপরীত ফলেরও উদয় হইয়া উপাসককে অবসন্ন করে। এ কথাটি মনে সর্ব্বদা জাগরূক রাখিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। অযথা শক্তিপ্রয়োগে বা নিজের স্বার্থসুখের জন্য শক্তিপ্রয়োগে পরিণামে শক্তিহানি এবং দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইবে নিশ্চয়। অগ্নি লইয়া খেলা করিতে যাইয়া অনেকে অনেক সময় নিজের গাত্র ও গৃহাদি দগ্ধ করিয়া বসে। স্থূল শক্তিতে উহা যেমন,

সূক্ষ্ম শক্তির সহিত খেলাতেও ঠিক তদ্রূপ, বরং অধিক কুফল প্রসব করে। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সর্ব্বপ্রকার শক্তির প্রয়োগই জানিয়া শুনিয়া শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সাবধানে করিতে হইবে। শারীরিক শক্তির অপব্যয়ে কত লোকেই না অকালবৃদ্ধ হইয়া আক্ষেপ-ভারপীড়িত জীবন বহন করিয়া আপনাকে ও সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। মানসিক শক্তির অপব্যয়ে কত লোকেই না আবার মেধাশূন্য, অস্থিরমনা ও উন্মাদপ্রায় হইয়া আপনাকে এবং অপরকে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যয়ে কতবার যে ভারত ও ভারতের দেশসমূহ পশু, বর্ব্বরতুল্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। হে উপাসক! এ সকল দৃষ্টান্ত মনে রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত সাবধানে শক্তিপূজায় অগ্রসর হইও।

মন্ত্রদাতা-গুরূপাসনার কথা প্রসঙ্গে বঙ্গের লৌকিকাচার—কুলগুরু ও গুরুবংশের উপাসনার কথা মনে উদয় হয়। আমরা উহাকে বঙ্গেরই আচারবিশেষ বলিলাম, কারণ, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঐরূপ আচার আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। সেখানে সংসারত্যাগী সাধু বা নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক গৃহস্থ—যাঁহার উপরেই কোন

ব্যক্তির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হইয়া থাকে, তাঁহারই নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণের রীতি প্রচলিত। সংসারত্যাগী গুরু হইলে তিনি যে, কোন্ প্রদেশের কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ঠিকানাই অনেক সময়ে পাওয়া যায় না। কাজেই গুরুকুলের উপাসনা অসম্ভব হইয়া পড়ে; এবং ধার্ম্মিক গৃহস্থ গুরু হইলে, তাঁহার জীবৎকাল পর্য্যন্ত বা তাঁহার শরীরত্যাগের কিছু পর পর্য্যন্ত শিষ্যের ভক্তি ঐ বংশের উপর প্রবাহিত থাকে, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু গুরুর পুত্র উপযুক্ত হউন বা নাই হউন এবং শিষ্যপুত্রের তাঁহার উপর শ্রদ্ধার উদয় হউক বা নাই হউক, তাঁহার নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বরলাভের সহায়-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে—এ প্রথার প্রচলন নাই।

বঙ্গে সংসারত্যাগী সাধুর সংখ্যা অল্প হওয়াতে এবং পিতার গুণ সন্তানে উপগত হয়—এই বিশ্বাস থাকাতে, ঐরূপ প্রথা প্রচলিত বলিয়া বোধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পুণ্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে ভদ্র বংশীয়দের সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের কথা প্রায় শ্রবণগোচরই হইত না। বিরল কেহ কেহ উত্তরপশ্চিম-প্রদেশাগত কোন কোন সাধুসন্ন্যাসীর ভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐ পথ

অবলম্বন করিলেও প্রায় জন্মের মত দেশত্যাগ করিয়া যাইত। কাজেই তাহাদের দ্বারা বঙ্গে আর ঐ সম্প্রদায় বৃদ্ধি পাইত না। আবার বঙ্গে তন্ত্রমতের সমধিক প্রচলন থাকাতে এবং ঐ মতে সস্ত্রীক ধর্ম্মোপাসনায় আশু ভগবৎকৃপা লাভ হয় প্রচার থাকাতে, নিষ্ঠাবান্ উদারমনা গৃহস্থকে গুরুরূপে বরণ করার প্রথাই প্রচলিত হয়।

বঙ্গের ঐ আচার এখন অনেকাংশে দূষণীয় হইলেও যতদিন না গুরুকুলের শিষ্যব্যবসায়বৃত্তি বা তদ্দারাই জীবিকানির্ব্বাহ করা রূপ কুপ্রথার প্রচলন হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এ প্রদেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে। উহা গুরুবংশের সন্তানগণের ভিতর গুরুনামের উপযুক্ত হইবার বাসনা প্রবল রাখিয়া বিদ্যা ও সদাচার পুষ্ট রাখিয়াছিল। আবার সমাজে এক শ্রেণী অনেকটা নিশ্চিন্তমনে কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাতে নিযুক্ত থাকায় ধর্ম্মাদর্শও তাঁহাদের ভিতর উজ্জ্বল থাকিয়া লোককল্যাণ সাধন করিত। ঔপনিষদিক সময়ে ঋষিকুল গৃহস্থ হইলেও ঐরূপ অবসর লাভে ধর্ম্মচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া সমগ্র দেশ এবং জাতির যে কত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত।

পূর্ব্বে বঙ্গে অন্নও সুপ্রতুল ছিল। মুসলমান রাজাধিকারেও সময়ে সময়ে টাকায় আট মণ চাউলের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। এখন অন্ন পর্য্যাপ্ত জন্মিলেও বাষ্পীয় শকটের কৃপায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এবং বাষ্পীয় পোতবাহনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানির প্রবল স্রোতে বঙ্গের অন্ন অন্যত্র নীত হয়। তদুপরি বিলাতি সভ্যতার মহার্ঘতা, বিদ্যাশিক্ষার বিপরীত ব্যয় প্রভৃতি নানা কারণে গুরু এবং শিষ্য উভয়েই ব্যতিব্যস্ত। উভয়কেই নানা উপায়ে কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। পরিশ্রম না করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ গুরুকুলের বহুকালাভ্যস্ত। সেজন্য তাঁহারাই সমধিক বিপদে পতিত হইয়াছেন; এবং মিথ্যাভাষণ, চাটুকারিতা প্রভৃতি নীচ উপায় সমূহ অবলম্বন করিয়া শিষ্যবর্গের মনোরঞ্জন দ্বারা অর্থসংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়া, তাঁহাদের অনেকেই এককালে ধর্ম্মতেজোবিহীন হইয়া হতশ্রী ও ইতর হইয়া পড়িয়াছেন। উপযুক্ত গুরুর অভাবে শিষ্যের ভক্তিও হ্রাস পাইয়াছে। এখন এ প্রথার উচ্ছেদ অনিবার্য্য এবং উচ্ছেদ হইলেও দেশের অকল্যাণ হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

আবার দেখা যায়, অবতার অথবা বিশেষ শক্তিসম্পন্ন

ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ যে বংশ পবিত্র করেন, তাহার প্রায়শঃ লোপ হইয়া থাকে ; অথবা সে বংশে আর সেরূপ শক্তিমান্ পুরুষের আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "Genius বা বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষ কোনও বংশে জন্মিবার কালে ঐ বংশের পূর্ব্বাপর যাবতীয় শক্তি যেমন নিঃশেষে আকর্ষিত হইয়া তাঁহাতে সমাবিষ্ট এবং প্রকাশিত হয়। সে জন্যই তাঁহার জন্মের পর ঐ বংশে বাতুল, শ্রীহীন বা অতি সাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমে ঐ বংশের অনেক স্থলে লোপও হইয়া যায়।" সেইজন্য অবতার বা সিদ্ধপুরুষ যে বংশ পবিত্র করিয়া থাকেন, তাহার উপর স্বতঃই লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রবাহিত হইলেও উহাতে ধর্ম্মশক্তির প্রকাশ সর্ব্বকাল স্থির থাকে না। উহাও বোধ হয় শিষ্য কুলের গুরুকুলের উপর ক্রমশঃ ভক্তিহীনতার অন্যতম কারণ।

মন্ত্রদাতা গুরু একজন হইলেও শিষ্য তাঁহার নিকট যাহা শিক্ষিতব্য শিক্ষা ও নিজ জীবনে সাধন করিয়া ধর্ম্মবিষয়িণী অপর শিক্ষাসমূহ অপর গুরুর নিকটে যে সম্পূর্ণ করিতে পারে, ইহা বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রের বিধান।

যাঁহারা ঐরূপ শিক্ষার সহায়তা করেন, তাঁহারাই উপগুরু নামে প্রসিদ্ধ।

আধ্যাত্মিক জগতে গুরূপাসনা ভিন্ন ভারতে ব্যবহারিক অপরা বিদ্যা—যথা, রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যাদি—বা অর্থকরী বিদ্যার শিক্ষয়িতারও বিশেষ সম্মান এবং পূজাবিধান আছে। বর্ত্তমানকালে উহার বিশেষ অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। উহাতে গুরু এবং শিষ্য অথবা শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই দোষ বর্ত্তমান বলিয়া বোধ হয়। শিক্ষক ছাত্রদিগকে নিজ তনয়ের ন্যায় ভালবাসা ও স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন না, ছাত্রেরাও শিক্ষককে পিতার ন্যায় ভক্তি ভালবাসা প্রদর্শন করে না। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধাহীনতাই আমাদের শিক্ষাজগতে সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে এবং শ্রদ্ধার অভাবেই আমাদের বালকদিগের যথার্থ শিক্ষালাভ হইতেছে না।" ছাত্র ও শিক্ষকের ভিতর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্বন্ধ থাকাতে এবং বিদ্যা যে কেবল অর্থোপার্জ্জনের জন্য নহে—জ্ঞানলাভের জন্য, এই ভাব বর্ত্তমান থাকাতেই ইউরোপে অধুনা বিদ্যার এত উন্নতি হইয়াছে। শিক্ষাকালে গুরুর সহিত একত্র বাসের এবং তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি

যাহাতে ভক্তির উদয় হয়, সে সকল বন্দোবস্তের অভাবই ঐ প্রকার শ্রদ্ধাহীনতার কারণ বলিয়া বোধ হয়। পুরাকালে ব্রহ্মচারী ছাত্রগণ গুরুকুলে বাস করিয়া যে কতদূর যথার্থ শিক্ষালাভ করিত, তাহা পুরাণেতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায়।

মানবে গুরুরূপিণী ঐশী শক্তি আবির্ভূতা হইয়া মানবজাতির পরমকল্যাণসাধনে যে প্রবৃত্তা হন, অথবা বর্ব্বর, বন্য মানবকে সমাজ, নীতি, বিদ্যা, ধর্ম্মাদি আলোক-দানে দেবতা করিয়া তুলেন—একথার পরিচয় ভারত যেদিন হইতে পাইয়াছে, সেই দিন হইতেই বুঝিয়াছে, গুরু মনুষ্য নহেন—গুরু নরশরীরে ঐশী বিকাশ! সে দিন হইতেই "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ" প্রভৃতি মন্ত্রের প্রচার। সেই সময় হইতেই প্রচার—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥"

—শ্বেতাশ্বতর।

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে কখনও জ্ঞানলাভ হয় না। হে ভারত! শ্রীগুরুর মূর্ত্তিতে শক্তিপূজা করিতে যতদিন তুমি না ভুলিবে ততদিন পৃথিবীতে এমন কে

আছে যে তোমার জাতীয় জীবন বা শক্তির লোপ করিতে পারে? গুরুবলে বলীয়ান! গুরুরূপী ধ্রুবতারা-নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হও!

আর তুমি, হে নিত্যমুক্ত আত্মারাম গুরো!—তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু সম্যক্ প্রস্ফুটিত কর! তোমাকে বার বার প্রণাম করি! তোমার কৃপায় প্রত্যেক ভারত-ভারতী নবীন আধ্যাত্মিক জীবনের দিব্যভাবের অমিততেজে সম্যক উদ্বুদ্ধ হউক এবং শ্রদ্ধাসহকারে তোমার পূজা করিয়া দেশের কল্যাণের জন্য নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বলিদানে সমর্থ হউক! হে শ্যামা, গুরু-রূপিণী! পদাশ্রিত ভারতে নবযুগে নবশক্তি সঞ্চারিত কর! যাহাতে তোমার শ্রীমূর্ত্তির জীবন্ত পূজা প্রচারে সে চিরকৃতার্থ হইতে পারে, অপরকেও তদ্রূপ করিতে পারে।

———

চতুর্থ প্রস্তাব

শক্তিপ্রতীক—দেব, মানব এবং অন্যান্য

সর্ব্বকালে যে কোন বস্তু বা ব্যক্তি সাধককে গন্তব্যের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে বা ধর্ম্মলাভের - নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব মানবাত্মা ও শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞান-লাভের—সহায়ক হইয়া তদ্বিষয় উচ্চভাবসমূহ তাহার ভিতর উদ্দীপিত করিয়াছে, ভারত তাহাকেই প্রতীকরূপে অবলম্বন করিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর সত্যসোপানে আরোহণ করিয়াছে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বজাতির ভিতরেই সত্যলাভের উহাই ক্রম। তবে, পৃথিবীর অন্য সকল জাতি নিম্ন সত্য হইতে উচ্চতর সত্যান্তরে উপনীত হইয়া প্রথমটিকে মিথ্যা বা ভ্রম বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে আর তাহার সহিত সম্পর্ক মাত্র রাখে নাই; শ্রদ্ধাসম্পন্ন ভারত তাহা না করিয়া অন্যরূপ করিয়াছে—কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে ঐ নিম্ন সত্যকে যথাযথ স্থানে রাখিয়া—উচ্চাদর্শ গ্রহণে এবং তদ্দ্বারা নিজ জীবন নিয়মিত

করিতে এখনও অসমর্থ পুরুষসকলের কল্যাণের নিমিত্ত —চিরকাল উহার পোষণ ও পূজা করিয়াছে। ভারত উচ্চ উচ্চতর আদর্শসমূহ লাভে স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াই ভাবিয়াছে, এই 'মই, বাঁশ, দড়ি বা সিঁড়ি অবলম্বনে আজ আমি সত্যসৌধের এই উচ্চ ছাদে আরোহণ করিলাম, কাল অন্য কেহও ত এই ছাদে উঠিবার সঙ্কল্প করিয়া অগমন করিতে পারে, তাহারও ত এই মই, বাঁশ দড়ি বা সিঁড়ি অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই ; অতএব তাহার বা তাহাদের সহায়তার জন্য উহা নষ্ট না করিয়া রাখিয়া দেওয়াই ভাল। ভারতের এই ভাবটিই শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া অমৃতময় গীতে এইরূপে চিরনিবদ্ধ করিয়াছেন :—

> "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
> যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"
>
> —গীতা।

জ্ঞানী সাধনফলে স্বয়ং ধর্ম্ম বা ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়ক উচ্চতম সত্যে আরোহণ করিয়াছেন বলিয়া দেশকাল-পাত্রভেদ বিচার না করিয়া, উহা জনসাধারণে প্রচার করিবেন না। কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তি দৃঢ়বিশ্বাসসহকারে শ্রীভগবানের উপাসনার নিমিত্ত যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে

রত, তৎসকলের অনুমোদন ও যথাসম্ভব আচরণ করিয়া, তাহার শ্রদ্ধা যাহাতে ঐ বিষয়ে আরও দৃঢ়ীভূত হয়, তাহাই করিবেন। কারণ, ধর্ম্মগত উচ্চতম সত্যের ধারণা ব্যক্তিগত সাধনের পরিপক্কাবস্থায় আপনা আপনি উদয় হইয়া থাকে। কেবলমাত্র কাহারও কথায় তল্লাভ কাহারও কখন হইবে না।

ঐ ভাবটি লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার বর্ত্তমান যুগে আমাদের শিক্ষা দিয়াছেন—"কাহারও ভাব নষ্ট করতে নাই; ভাব নষ্ট করা মহা দোষ। যেমন ভাব—তেমন লাভ। ভাব আশ্রয় করিয়াই মানুষ সত্যবস্তু লাভ করে; কারণ শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভাবময়! সোলার আতা বা হাতী দেখিলে যেমন সত্যের আতা ও হাতী মনে পড়ে, সেইরূপ মৃন্ময়ী, পাষাণময়ী মূর্ত্তি দেখিলে চিন্ময়ী মূর্ত্তির উদ্দীপনা হয়," ইত্যাদি।

শক্তিপূজার অবতারণায় আমরা প্রথমেই গুরূপাসনার উল্লেখ করিয়াছি। কেন না, গুরুপ্রতীকই সর্ব্বপ্রতীক-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইয়া বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বাগ্রে পূজিত হইয়া থাকে। হইবারই কথা—কারণ, শ্রীগুরুই ইষ্টমন্দিরের দ্বারস্বরূপ। দ্বাররুদ্ধ থাকিলে যেমন মন্দিরে প্রবেশ লাভ হয় না, শ্রীভগবানের

গুরুশক্তি প্রসন্ন না হইলে, সেইরূপ মানবের ইষ্টদর্শনাশা বৃথা। মায়ানিরুদ্ধদৃষ্টি ভ্রান্ত মানবের চক্ষুরুন্মীলন করিবার জন্যই কৃপাপরবশ শ্রীভগবানের গুরুরূপে উদয়। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে মানব যাহা কিছু সত্য বা জ্ঞান লাভ করিয়াছে বা করিবে, তাহা ঐ গুরুশক্তি-প্রভাবে। বাহ্যান্তরভেদে নানা প্রতীক অবলম্বনে গুরু-শক্তিই প্রকাশিত হইয়া তাহাকে ধীরনিশ্চিত গতিতে দেশকালাবচ্ছিন্ন জগতে নিম্ন সত্য হইতে উচ্চতর এবং উচ্চতম সত্যে আরূঢ় করাইতেছে। আবার ঐ গুরুশক্তিই পূর্ণ স্বরূপে, সাত্ত্বিকবিগ্রহে মানবশরীর ও মানবীয় ভাবাবলম্বনে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া, নিত্য নূতন নূতন ধর্ম্মাদর্শ নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া, মানবকে সেই ছাঁচে জীবন গঠিত করিতে শিক্ষা দিয়া, দেশকালাতীত, কেবলানন্দরূপ সমাধিতে তুরীয় সত্যানুভবের উপায় সহজ ও সুখবোধ্য করিয়া দিতেছে! সেইজন্যই উপনিষদে আপ্তকাম ঋষি গাহিয়াছেন,—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

"ইষ্টদেবের ন্যায় গুরুতে যাহার পরম ভক্তিশ্রদ্ধা,

তাহারই নিকট পরম সত্য আপন স্বরূপ প্রকাশ করেন।" সেই জন্যই কথিত আছে,—

"শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা, গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।"

—গুরুগীতা।

দেবদেব উপেক্ষিত হইলে গুরুশক্তিসহায়ে মানব তাঁহার প্রসন্নতা পুনরায় লাভ করিতে পারে, কিন্তু দয়াঘনমূর্ত্তি শ্রীগুরুশক্তি কোনও কারণে অপ্রসন্না হইলে, মানবের জ্ঞানলাভের দ্বার বহুকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গাঢ় অন্ধতম আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে—সে তমোগুণের হস্ত হইতে নিস্তার লাভ এক জীবনে কখনই সম্ভবপর হয় না। সেই জন্যই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ইংরাজিভাবাপন্ন শ্রদ্ধানভিজ্ঞ বালশিষ্যমণ্ডলীকে নিজ শরীর দেখাইয়া বলিতেন,—"ছ্যাখ, এটা কেবল খোলমাত্র; এই খোলটাকে আশ্রয় করে শুদ্ধবোধানন্দময়ী মা লোকশিক্ষা দিচ্চেন; সেজন্য এর কাছে এলে, একে স্পর্শ কর্‌লে, এর সেবা কর্‌লে লোকের ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হয়ে ঈশ্বরলাভ হয়; কিন্তু খুব সাবধানে শ্রদ্ধার সহিত এটার সেবা কর্‌বি। শ্রদ্ধার অভাবে আমি রাগ কর্‌ব না; কিন্তু এর ভিতর যে আছে, সে যদি অবজ্ঞাত হয়ে একবার

ছুবলে দেয়, তা হলে জ্বালায় অস্থির হতে হবে।" এক সময়ে কোন দুরন্ত শিষ্য নিজ ঘৃণিত জীবনালোচনায় ক্ষুব্ধ হইয়া দুঃখে অভিমানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে নানা অযথাভাষণ করে। অপার দয়ানিধি শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে তাহার জন্য বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া ব্যাকুলভাবে বলিয়াছিলেন, "ওরে, ও আমাকে যা বলে, বলুক গে; (নিজ শরার দেখাইয়া) এর ভিতরে যে আছে, তাকে ত কিছু বলে নি? আমার চিদানন্দময়ী মাকে ত কিছু বলে নি?"

হে ভারত, সাবধান! গুরুশক্তিবলে বলীয়ান্! বিদেশী ভাবাপন্ন হইয়া আজ বিদেশী অনুকরণে শ্রীগুরুর পূজায় অবহেলা করিও না; আজ আট শত বৎসরের অধিক কাল হইল, নানারূপে নানাভাবে বিদেশী আসিয়া, কখন স্তুতিবাদ করিয়া, আবার কখন বা ভয় দেখাইয়া তোমাকে ঐ শক্তিপূজায় বিরত হইতে পরামর্শ দিতেছে—পাশব বল প্রয়োগে বিধ্বস্ত করিয়া, দুঃখদারিদ্র্যনিপীড়িত তোমার পরিম্লান চক্ষের সমক্ষে নানা প্রলোভন আনিয়া একে একে ধরিতেছে। কিন্তু শ্রীগুরুশক্তিরই পরিণামে জয় ভাবিয়া, তুমিও এতদিন তাহা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছ। সেজন্য বাবিল,

মিসর, রোম, গ্রীস ও তুর্কাদি জাতিসমূহ দুর্জ্জয় কালস্রোতে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইলেও, কৌপীনমাত্রাচ্ছাদিতকটি, তিতিক্ষাসম্বল, অনিত্যের ভিতর সর্ব্বদা নিত্যদর্শনাভিলাষী, গুরুপাদনিবদ্ধদৃষ্টি ও তদনন্যশরণ তোমার সন্তানকুল সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আজও বর্ত্তমান! তোমারই পুণ্যক্ষেত্রে আজও সর্ব্বদেবদেবীস্বরূপ দিব্য গুরুশক্তি মানুষী তনু পরিগ্রহ করিয়া নিজমহিমা প্রকাশ করিয়া "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং" আবির্ভূতা হইতেছেন। তোমারই সন্তানকুলের সমষ্টিভূতমূর্ত্তিস্বরূপ নরাবতার অর্জ্জুন, কুরুক্ষেত্র সমরের প্রথমাঙ্কে শ্রীগুরুপাদুকোদ্দেশে সর্ব্বতোভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া কাতরকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন,—

"কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥"

—গীতা।

"হে প্রভু ভয়, মমতা প্রভৃতি নানা দুর্ব্বলতায় আচ্ছন্ন হইয়া আমি, কি যে করা কর্ত্তব্য, তাহা কিছুই বুঝিতে

পারিতেছি না। আমার অহঙ্কার অভিমান দূর হইয়াছে—আমি এখন দয়ার পাত্র। এ সময় যাহা করা কর্ত্তব্য, যাহা করিলে আমার ও অন্যের মঙ্গল হয় এবং অধর্ম্মাচরণ করা না হয় তাহাই আমায় বলিয়া দাও। আমি তোমার শরণাগত শিষ্য—আমাকে আশ্রয় দাও, পথ দেখাও।”

—তাহা তোমার প্রত্যেক এবং সকল সন্তানের জন্যই উচ্চারিত হইয়াছিল। সে হৃদয়ের প্রার্থনা শ্রীগুরু-চরণপ্রান্তে সকলের জন্য সর্ব্বকালের নিমিত্ত পৌঁছিয়াছে! সে অভয়বাণী—“অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ”—তোমার সন্তানের প্রত্যেককে জ্ঞাত বা অজ্ঞতসারে দৈব-বলে বলীয়ান্ করিয়া রাখিয়াছে! ধৈর্য্য ধর, পবিত্রভাবে নির্ভীকহৃদয়ে তাঁহারই অনন্যশরণ হইয়া থাক—তোমাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীগুরুর এখনও অনেক লীলা প্রকটিত হইবে। দেখিতেছ না কি—অন্তর্জগতে, ধর্ম্মজগতে তোমার সন্তান এখনও রাজা? ইতিহাস-সহায়ে দেখ—সর্ব্ব-কালে বৈদেশিক নির্য্যাতন তোমার সন্তানের মাংস-পিণ্ডময় ক্ষণভঙ্গুর শরীরটাকেই কয়েক দিনের জন্য মাত্র নানাপ্রকারে ক্লিষ্ট করিতে পারিয়াছে—তাহার

অমরাত্মাকে কে বাঁধিবে ? কে কখন তাহার অপ্রতিহত গতি রোধ করিয়াছে ? সত্যকে ধরিয়া, ন্যায়কে ধরিয়া ধর্ম্মে সদা প্রতিষ্ঠিত থাক, জানিও—ভাব-জগৎই স্থূল জগৎটাকে ইচ্ছামত ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছে, পরিবর্ত্তিত ও নিয়মিত করিতেছে ; জানিও—কোন শর্ব্বরীই চিরস্থায়ী নয় সকল অবস্থারই পরিবর্ত্তন ধ্রুব। অহেতুকদয়াসিন্ধু শ্রীগুরুর পূজা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু ভারতে নানা প্রতীকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তত্তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া, আমরা পুনরায় শক্তি-পূজার সহায়ক অন্যান্য প্রতীকের কথা পাঠকের সম্মুখে আনয়ন করিব না।

শ্রদ্ধাবাতাহতা, প্রেমবিকম্পভঙ্গিতা, বিজ্ঞানগুহা-শয়িনী, প্রণবনাদিনী, চিরপাবনকরী, ভাবময়ী ধর্ম্ম-গঙ্গার উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতকুলের অনেক মানবের অন্তঃস্থিত ভীতি-শৈলের শিখরদেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কেহ বা বলিয়াছেন—সৃষ্টিকল্পের প্রারম্ভে আদিম মানব বিচিত্র শক্তিশালী নানা পদার্থের সমষ্টিভূত—বিশ্ববিরাট্ দর্শনে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশের অবলম্বনসমূহের পশ্চাতে ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর কল্পনা

করিয়া হৃদয়ের পূজা অর্পণ করিয়াছিল; ঐ বিস্ময়-ভূধরের পাদমূলেই সনাতনী ধর্ম্ম-ভাগীরথীর আদিম বিকাশ!—উহাই প্রতীকোপাসনার বাস্তব মূল। ভারতের বেদগান ঐরূপেই প্রথমে সমুত্থিত হইয়া, জলদগম্ভীর সামধ্বনি ও পূতগন্ধী বিশ্বদেববলিধূমে সান্ধ্যগগন পূর্ণ করিয়াছিল।

আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। চিজ্জড়সম্মিলনী, বিপরীত-গুণধারিণী, বাহ্যান্তরপ্রতিঘাতিনী, উভয়মুখী মানবপ্রকৃতি সর্ব্বকালেই এক বিষম জটিল রহস্য। সহস্র সহস্র বৎসরের নানা ঘাতপ্রতিঘাত এবং ভূয়োদর্শন-সহায়েই তাহাতে নিত্য জীবেশ্বরসম্বন্ধ, পরলোকাস্তিত্ব, আত্মার চিন্ময়ত্ব ও অমরত্ব, সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব এবং দেববিগ্রহাদির বর্ত্তমানত্বাদি-মূলক বিশ্বাসনিচয় একত্রীভূত হইয়া বর্ত্তমান ধর্ম্মবিশ্বাসরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। জটিল মানবপ্রকৃতির জটিল ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎপত্তি জটিলভাবেই সাধিত হইয়াছিল। তুঙ্গশৃঙ্গ গিরিরাজি, সর্ব্বগ্রাসকর জলধি, বিকটোল্লাস অশনি, নিশি-দিবাকর সূর্য্য, রাগরঞ্জিত উষা প্রভৃতি বাহিরের ভীষণ ও সুন্দর পদার্থনিচয়, যেমন জাগ্রদবস্থায় আদিম মানবের মনে ভীতিবিস্ময়াদি ভাবসমূহের উদয়

করিয়া বাহ্য প্রতীকাবলম্বনে নানা দেবদেবীর পূজা করিতে তাহাকে শিখাইয়াছিল, সেইরূপ মোহময়ী নিদ্রারাজ্যে নিত্য প্রবিষ্ট হইয়া সে অঘটনঘটনপটীয়ান্ স্বপ্নের কুহকে যে সমস্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব দেশ, কাল, পাত্রাদির অনুভব করিত, ঐ সকলকে জাগ্রদনুভূত পদার্থসকলের ন্যায় বাস্তব বলিয়া বিবেচনা করিয়া সে ইহলোক-ভিন্ন অপর এক লোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে শিখিল। বাহ্যান্তরভেদে এইরূপে দুই প্রকার অনুভবের সহায়ে তাহার দুই প্রকার শিক্ষা যুগপৎ চলিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়।

কালে সর্ব্বরহস্যের উচ্চতম রহস্য মৃত্যুর সহিতও তাহার পরিচয় হইতে লাগিল এবং ক্রমে তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল—মৃত্যু অনিবার্য্য, মৃত্যু সকলকেই একদিন গ্রাস করিবে। অধীরহৃদয়ে সে ভাবিতে লাগিল—এ কি ? এ আবার কোন্ দেবতা ? এইরূপে নচিকেতারূপী মানব মৃত্যুমুখেই ক্রমশঃ শিখিল—ইহকালেই তাহার অস্তিত্ব পর্য্যবসিত নহে—পরকাল আছে—এবং পরকালেও তাহার অস্তিত্ব সুনিশ্চয়। প্রেতাত্মাসকলের স্বপ্নে ও কখন কখন জাগ্রতে সন্দর্শনে তাহার ঐ পরকাল-বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। জগতের সকল জাতির প্রাচীন পুরাণ-

সংগ্রহে উক্ত প্রেতাত্মাকুলের দর্শনের কথা লিপিবদ্ধ আছে এবং এখনও ঐরূপে প্রেতাত্মাকুলের দর্শন যে সম্ভবপর, এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার বহুলোক, কি প্রাচ্য কি পাশ্চত্য সকল ভূখণ্ডেই বিদ্যমান। ঐরূপ দর্শন হইতেই যে প্রাচীন যুগে পিতৃপুরুষের পূজা প্রচলিত হয়, এ বিষয় নিঃসন্দেহ। প্রাচীন মিসরে ঐ সকল প্রেতাত্মা 'কা' নামে নির্দ্দিষ্ট হইত। ঐ 'কা' সকল, তাহাদের জীবিত সন্তানাদির নিকট আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব দুঃখকষ্টের কথা জানাইত। "আমাদের অন্ন দে, বস্ত্র দে, অন্য সব ভোগ্য পদার্থ দে"—ইত্যাদি বলিত; "না দিলে তোদের ধ্বংস করিব"—বলিয়া ভয় দেখাইত —এ সকল কথা তাহাদের ভিতর লিপিবদ্ধ আছে। ভারতের পিতৃশ্রাদ্ধাদি, চীন ও জাপানের সিণ্টো-উপাসনা, ইউরোপ এবং আমেরিকার পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও বর্ত্তমান যুগের ভূতুড়ে চক্রানুষ্ঠান (Spiritualism and Seance) প্রভৃতি ঐ বিষয়ের যথেষ্ট সাক্ষ্য।

এইরূপে যত দিন না আদিম মানবের মনে পরকাল-বিশ্বাস সমুদ্ভূত হইয়াছিল, ততদিন যে সে ধর্ম্মবিশ্বাসে ধনী হইয়াছিল, একথা বলা যায় না। আবার পরকাল-

বিশ্বাস এবং বিভিন্ন শক্তির আধার নানা দেবদেবীতে বিশ্বাস যে তাহার মনে যুগপৎ উদয় হইয়াছিল—একথাই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমে ঐ সকল দেবদেবীর আবাস হিমালয়, সিনাই প্রভৃতি অত্যুচ্চ ভূধরশৃঙ্গে নির্দ্ধারিত হয়। পরে মানব যখন সাহসাবলম্বনে ঐ সকল গিরিচূড়ার মস্তকে উঠিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও ঐ সকল দেবদেবীর পরিচায়ক চিহ্নমাত্রেরও দর্শন পাইল না, তখন স্থির হইল, তাঁহারা কখন কখন ঐ সকল ভূস্বর্গে আগমন করেন মাত্র—নতুবা তাঁহাদের চিরবাসস্থল নানানক্ষত্র-বিরাজিত ঐ সুনীল গগনের উপর 'দ্যৌঃপিতরে'র অবস্থানভূমিতে, কৈলাসে, গোলোকে, কিন্নর-কিন্নরী শোভিত স্বর্গে, ইত্যাদি। আবার উচ্চাবচ পুণ্যপাপময় কর্ম্মের কথা আলোচনায় উক্ত পরলোকবিশ্বাসও ক্রমে পিতৃলোক, দেবলোক, অন্ধতমোবিশিষ্ট লোক, নরক এবং তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতিতে মৃতব্যক্তিসকলের স্থান নির্দ্ধারিত করিল।

এইবার পৃথিবীতে বহুকাল বাস ও বহুদর্শনের ফলে মানবজাতির মধ্যে ভূতবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের অঙ্কুরসমূহ ধীরে ধীরে উদ্গত হইতে লাগিল এবং ঐ

সকল ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর শক্তি এক মহাশক্তিমানের লীলা বলিয়া অনুমিত হইয়া তাহাকে কালে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী করিয়া তুলিল। স্তম্ভিতহৃদয়ে মানব ভাবিল—যিনি সকলের নিয়ন্তা,—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনম্।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ॥"

—কঠোপনিষৎ।

"যাঁহার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়েই খাদ্যরূপে পরিগণিত, স্বয়ং মৃত্যু যাঁহার ঐ খাদ্যের উপযোগী ব্যঞ্জনসদৃশ, সেই কালান্তক বিশ্বদেবকে কে জানিতে সক্ষম ?"

কিন্তু এই খানেই শেষ হইল না! এইবার ঔপনিষদিক যুগের প্রারম্ভ হইল। মানব ধ্যানাদি-সহায়ে জানিতে ছুটিল—সেই ঈশ্বর সৃষ্টির বাহিরে বা অন্তরে। প্রথমে স্থির হইল—তিনি সৃষ্টির বাহিরে—সৃষ্ট বিশ্ব হইতে অত্যন্ত বিভিন্নগুণবিশিষ্ট ; জীব সেবক, তিনি সেব্য ; জীব তাঁহাকে কখন ধরিতে ছুঁইতে পারিবে না।

পরে স্থির হইল—তিনি সৃষ্টির অন্তরে ও বাহিরে—বিশ্ব তাঁহার একাংশে বর্ত্তমান—"একাংশেন স্থিতো

জগৎ" ; জীব অংশ, তিনি পূর্ণ ; দেহের সহিত ভিন্ন ভিন্ন অবয়বাদির সম্বন্ধের ন্যায় উভয়ে অবস্থিত। শেষে স্থির হইল—সসীম মন বুদ্ধির ভিতর দিয়া তাঁহাকে দেখিলেই তিনি বিশ্বরূপে আপাতপ্রতীত হন মাত্র! কোনক্রমে মনবুদ্ধিরূপ গণ্ডির বাহিরে যাইতে পারিলে তবে শুদ্ধ সত্যানুভব সাধ্য ; সেখানে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" —দুই ত নাইই, এক যে আছে, একথাও বলা যায় না ; তিনি পূর্ণ, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। আর জীব ?—জীব বলিয়া কোন পদার্থ এখানে থাকিলেও সেখানে নাই! —সাধকাগ্রণী শ্রীরামপ্রসাদ যেমন বলিয়াছিলেন—

"বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ,
ঘটের নাশকে মরণ বলে।
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য
মান্য করে সব খোয়ালে॥
প্রসাদ বলে, যা ছিলি ভাই,
তাই হবি তুই নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়,
জল হয়ে সে মিশায় জলে॥"

তবে পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর্ম্মাকর্ম্মের কারণ কি ? —যতক্ষণ শরীর, মন, বুদ্ধির গণ্ডির ভিতর, ততক্ষণ

ওসকল সত্য ; যেমন যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রতীত।

তবে এ সংসার-স্বপ্ন মৃত্যু হইলেই কি ভাঙ্গিয়া যায় ? না—কোটি জন্মেও, বিজ্ঞানের উদয় না হইলে ভাঙ্গে না। আবার তীব্র ইচ্ছাসহায়ে এক জন্মেই উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এইরূপে সম্পূর্ণ ধর্ম্মচক্র ভারতে প্রবর্ত্তিত হইল। বাকি রহিল মাত্র—তর্কযুক্তিসহায়ে উহাকে মানব-মনের যথাসম্ভব বোধগম্য করা এবং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ যাহাতে ঐ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সেই ভাবে সমাজ গঠন। ভারতের কপিলাদি দার্শনিকগণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধ, শঙ্করাদি অবতারনামা যত মহাপুরুষ অন্যাবধি ভারতে শরীর পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন ও করিতেছেন। সে অনেক কথা —কিন্তু ইহা তাহার স্থান নহে।

পাশ্চত্য পণ্ডিতকুলের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গবেষণা পাঠ করিলে উহাতে বিশেষ অঙ্গহানি লক্ষ্য হইয়া থাকে। হইবারই কথা। কারণ, পাশ্চত্যপ্রদেশ এতকালেও কর্ম্মী ভিন্ন একজনও বিশিষ্ট ধর্ম্মবিজ্ঞানীর জন্মদানে

সক্ষম হইল না। প্রাচ্যভূমি আসিয়া, বিশেষতঃ ভারত হইতেই ধর্ম্মালোক যে পাশ্চাত্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতীত যুগে বরাবর সঞ্চারিত হয়, এ বিষয়ের সত্যতা, পৃথিবীর প্রাচীনেতিহাস যতই আলোচিত হইবে, ততই প্রমাণিত হইবে—ততই মানব বুঝিতে পারিবে, হিন্দুর নিত্য-পূজ্য বেদ হইতেই ধর্ম্মালোক পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়াছে। খৃষ্ট জন্মিবার সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল পূর্ব্বে যখন গ্রীক জাতি বিশেষ বলদৃপ্ত হইয়া অন্যান্য সকল জাতিকে পাশব বলে আপন অধীনে আনিতে ব্যস্ত, তখন হইতে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার আদিগুরু গ্রীসের সহিত ভারতের সম্বন্ধবিস্তারের কথা ইতিহাস স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছে। তাহার পূর্ব্বে যে সম্বন্ধ ছিল না একথাও স্পষ্ট বলা যায় না। ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক এবং কোন কোন স্থলে ভারতের বণিক্ কুলও যে, ঐ কাল হইতে গ্রীস এবং তৎসন্তান রোম সাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, এ বিষয়েও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পালিস্তানের আন্টিয়ক্ সহরে ভারত সম্রাট্ ধর্ম্মাশোকের ধর্ম্মশাসনক্ষোদিত প্রস্তরস্তম্ভ ঐ বিষয়েরজ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ এখনও দণ্ডায়মান। ইউরোপের উল্লেখযোগ্য প্রথমদার্শনিক 'পিতাগোরসে'র

—নাম এবং সংখ্যা হইতে জগদুৎপত্তিরূপ দার্শনিক মতে ভারতের পূতগন্ধের বিশেষ অনুভূতি হয়। কে না জানে—ভারতের সাধু ও আচার্য্যকুল অদ্যাবধি 'পিতা, গুরু' শব্দাদিতে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অভিহিত হন? কে না জানে—শ্রীভগবদবতার মহামুনি কপিল চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে জগদুৎপত্তি নির্ণয় করিয়া, আপন মীমাংসা 'সাংখ্য' নামে জনসাধারণে প্রচারিত করেন? সংখ্যা হইতে যে উক্ত সমাধান 'সাংখ্য' শব্দে অভিহিত —একথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এইরূপে গ্রীস ও রোমের ভিতর দিয়া যে ভারতের ধর্ম্মমতসমূহই পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে প্রচারিত হইয়াছিল—এ বিষয়ের প্রমাণসংগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

প্রাচীন ইউরোপে ধর্ম্মালোক-বিস্তারের আর এক কেন্দ্র ছিল—মিসর। ঐ মিসরও যে ভারতের ধর্ম্মালোকে দীপ্ত হইয়াছিল—এ বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রাচীন মিসরি মিসরের দক্ষিণ সমুদ্র দিয়া নৌকারোহণে ঐ দেশে প্রথম আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে—এ কথা মিসরদের প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। মিসরের দক্ষিণে ভারত ভিন্ন অন্য প্রদেশ নাই। আবার দেখিতে পাওয়া যায়—

দাক্ষিণাত্যের মাদ্রাজাদি প্রদেশের দ্রাবীড়ির সহিত প্রাচীন মিসরির রং, ঢং, চেহারা, আচার, ব্যবহার এবং পূজ্য দেবদেবীর বিশেষ সাদৃশ্য বর্ত্তমান—সেই শিবশক্তি পূজা, ষাঁড়ের সম্মান, বাবরি কাটা চুল, ধূতিপরা, কাছাহীন, মিস্ কালো রঙ! কাজেই কে না বলিবে—ঐ দ্রাবীড়িই মিসরে যাইয়া বহুপূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল? পরে স্থলপথেও যে ভারতের সহিত মিসরের বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল—এ বিষয়ের প্রমাণও প্রাচীনেতিহাস, এবং আসিয়ার অনেক স্থলে এখনও বর্ত্তমান বণিক্‌কুলের গতায়তের পথসমূহ (overland trade-routes) হইতে নির্ণীত হইয়াছে। খৃষ্টান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশার ঐ মিসরে বহুকাল বাসের কথা বাইবেলের নবভাগে নিবদ্ধ। আবার কেহ কেহ বলেন—তাঁহার ভারতেও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য আগমন হইয়াছিল। যাহাই হউক, তৎপ্রচারিত মতের অধিকাংশই যে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ইরাণি ধর্ম্মপুস্তক ‘জেন্দাবেস্তা’ হইতে সংগৃহীত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; সেই ভালমন্দ দুই শক্তির দ্বন্দ্বে উত্তমের জয়, সেই উত্তমের অনুজ্ঞায় মন্দের মানবকে প্রলোভিত করিয়া পরীক্ষা, সেই উত্তমের কৃপাপরবশ হইয়া স্বয়ং

নরশরীরাবলম্বনে মানবকৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করণ! আবার ঈশাশিষ্য ম্যাথু-লিখিত প্রচারবিবরণীতে গ্যালিলি প্রদেশস্থ শৈলপাদমূলে ঈশার ধর্ম্মোপদেশ-সম্বন্ধী যে সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে, অবিকল সেই সমস্ত কথাই বৌদ্ধগ্রন্থে লিপিবদ্ধ শ্রীভগবদবতার বুদ্ধের শৈলপ্রচারে বিবৃত রহিয়াছে। অতএব বৌদ্ধমতের কতক কতকও যে ঈশার মতমধ্যে প্রবিষ্ট আছে—তাহাও প্রমাণিত। ঈশাশিষ্য যোহন-লিখিত প্রচার-বিবরণীর পূর্ব্বভাগে অতি অপরিস্ফুটভাবে লিপিবদ্ধ ভারতের চিরন্তন সম্পত্তি—নাদব্রহ্ম-বাদের কথাও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য।

পাশ্চাত্যভূমি এইরূপে ভারতের ধর্ম্মালোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে উদ্ভাসিত হইতেছিল, এমন সময়ে জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও উন্নতি আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং উহারই ফলে ঐ ভূমিতে ধর্ম্মালোক পরিক্ষীণ হইয়া জড়বাদের অধিকার বিস্তৃত হইল। জড়বাদী জড়শক্তির বিস্তৃত তত্ত্বলাভে তৎপ্রয়োগ-বিজ্ঞানমাত্র কুশলী। অতএব পাশববলোন্মত্ত পাশ্চাত্যের ধর্ম্মমীমাংসা এখন যে গীতানিবদ্ধ নিম্নোদ্ধৃত বচনের অনুরূপ হইবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—

"অসত্যম প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥
এতাং দৃষ্টিমষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥
কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥"

—গীতা ।

"ঈশ্বরই নাই, তা ঈশ্বর আবার জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কামই স্ত্রী-পুরুষের সংযোগ করিয়া জগৎ-সৃষ্টির কারণ। কামোপভোগই জগতে পরম পদার্থ —এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতি ব্যক্তি অহঙ্কার অভিমানে মত্ত হইয়া ঐ ভোগ কি প্রকারে পাইবে, এই চিন্তাতেই অহরহ কালযাপন করে এবং নানা অসদুপায় অবলম্বনেও পরাঙ্মুখ হয় না।"

অতএব ভারতের ঋষি এবং অবতারকুলের ঐ সম্বন্ধী মীমাংসার অনুসরণ না করিয়া পাশ্চাত্যের অনুসরণে যে আমাদের সমূহ ক্ষতি এবং কালে ধ্বংসের বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা আর বলিতে হইবে না। অতএব

পূর্ব্ব হইতেই ঐ বিষয়ে আমাদের সাবধান থাকিতে হইবে। সর্ব্বকালে সমাধিগত প্রত্যক্ষই ধর্ম্মের মূল। ঐ প্রত্যক্ষভূমির আভাস আবার জনসাধারণ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ও অনুভাবয়িতা আপ্তপুরুষ-কুলের 'পাবনং পাবনানাং' জীবনচরিতে, ও তদ্ভাবে গঠিত সিদ্ধকাম সাধকের জীবনে পাইয়াই উহাতে বিশ্বাসী হইয়া থাকে। ঐরূপ পুরুষের দর্শন, স্পর্শন ব্যতীত ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, মায়াগ্রস্ত জীবকুলের মায়াতীত নিত্যানন্দের আভাস লাভ সুদূর-পরাহত। আবার, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—জড় ভাবিতে ভাবিতে লোকে জড় হইয়া যায় এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের চিন্তায় মানব তৎস্বরূপই প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্যভূমির বহুকাল ঐরূপ আপ্তপুরুষের পবিত্র-সন্দর্শনলাভ হয় নাই; তদুপরি জড়ের চিন্তাতেও বহুকালাতীত হইয়াছে। কাজেই ঐ দুর্দ্দশা! তবে ভারতের ধর্ম্মালোক আবার বর্ত্তমান যুগে শ্রীভগবানের অপার কৃপায় অসুরমতাবলম্বী পাশ্চাত্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেজন্য আশা হয়, আবার পাশ্চাত্য ভারতকে ধর্ম্মগুরুত্বে বরণ করিয়া, ধ্বংসের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবে এবং জগতের

যথার্থ কল্যাণে ক্রমশঃ নিজশক্তি প্রয়োগ করিতে শিখিবে।

দেববলে বলীয়ান্ ভারত চিরকাল ধর্ম্মসাক্ষাৎকার করিতেই নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। ঐ চেষ্টা বা সাধনফলেই পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মবিশ্বাস সমূহের সত্যতা সম্বন্ধে সে সাক্ষাৎ প্রমাণ পাইয়াছে। ভারত দেখিয়াছে—সত্যই প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বাসসহায়ে এই বহুকালাগত সংসার-স্বপ্ন একদিন ভাঙ্গিয়া যায়; সত্যই সহস্র সহস্র বৎসরের অন্ধকারময় গৃহ ঈশ্বরকৃপায় এক মুহূর্ত্তে আলোক পূর্ণ হয়! ভারত দেখিয়াছে— সত্যই, শ্রীভগবান্ পূর্ণচিদানন্দস্বরূপে সকলের হৃদ্দেশে জ্বলন্তভাবে বিদ্যমান থাকিয়া সকলকে ফিরাইতেছেন, ঘুরাইতেছেন, উদ্দেশ্যবিশেষে চালিত করিতেছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"—গীতা।

সত্যই, কেবল তাঁহার শরণাপন্ন হইলে পূর্ণ শান্তি লাভ—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়!"—নতুবা আর অন্য উপায় নাই।

যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকাবলম্বনে শ্রীভগবচ্ছক্তি মানব নয়নে প্রকাশিতা হইয়াছেন। বৈদিক যুগের

তেত্রিশটি দেবপ্রতীক এইরূপে পৌরাণিক যুগে তিন শত তেত্রিশ কোটী দেবপ্রতীকে পরিণত। তাই বলিয়া কেহ না অনুমান করেন—ঐ তিন শত তেত্রিশ কোটী দেবকুলের প্রত্যেকেই এক সময়ে সমভাবে মানবমনে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধর্ম্মেতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়—ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেবপ্রতীকোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়া, ভারতে পূজালাভ করিয়া, মানবের ধর্ম্মলাভের সহায়ক হইয়াছিল। মন্ত্র-শাস্ত্রাদি পাঠে ঐরূপ কত দেবতার নাম মাত্র কেবলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের ধ্যান এবং পূজাপদ্ধতি সকল বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে। তিব্বত, চীন, জাপানাদি প্রদেশে ঐ সকল দেবতার পূজাপ্রচার এখনও দেখিতে পাওয়া যায়! ভারতের ধর্ম্মপ্রচারক যে, বহু প্রাচীন যুগে ঐ সকল দেবপূজা ভারত হইতে উক্ত প্রদেশসকলে লইয়া গিয়াছিল, তাহাও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধযুগে শতদলে আসীন উজ্জ্বল বুদ্ধমূর্ত্তিই প্রতীকরূপে উত্তর ভারতের অনেক স্থলে অবলম্বিত হয়। ক্রমে উহাই শতদলমধ্যবর্ত্তী উজ্জ্বলালোকে বা পদ্মান্তর্গত উজ্জ্বলকিরণবর্ষী মণিখণ্ডে পরিণত হয়। তিব্বতে এবং অন্যান্য বৌদ্ধদেশে এখনও উহাই যে, সাধকের

ধ্যানাবলম্বন, তাহা 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' ইত্যাদি মন্ত্রেই স্পষ্ট ব্যক্ত।

বহির্জগতের পদার্থনিচয়ের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরীণ নানা পদার্থও প্রতীকরূপে কালে অবলম্বিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি এখনও বর্ত্তমান এবং কতকগুলি অধুনা লোপ পাইয়াছে। হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যগত উজ্জ্বল আকাশ বা "দহরাকাশ" নয়নান্তর্ব্বর্ত্তী ছায়া বা 'ছায়া-পুরুষ' ইত্যাদি ঐরূপে এককালে প্রতীকরূপে অবলম্বিত হইয়াছিল—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্যে ঐ সকলের বিশেষ উল্লেখ থাকায়, কালে উহাদের পূজা প্রচলন থাকা স্পষ্ট প্রতীত হয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম—এই ভূতপঞ্চের প্রত্যেকটি এবং অন্ন, প্রাণ, মন প্রভৃতিও যে কালে সূক্ষ্মদর্শী মানব কর্তৃক ব্রহ্মপ্রতীকরূপে অবলম্বিত ও উপাসিত হয়—এ বিষয়ের প্রমাণও উপনিষৎনিবদ্ধ "কং ব্রহ্মেত্যুপাসীত"—"খং ব্রহ্ম"—"অন্নং ব্রহ্ম"—ইত্যাদি বহুবিধ বচনাবলীতে উপলব্ধি হয়। শব্দপ্রতীক সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরভাবে আলোচিত হইয়া ক্রমে মাণ্ডূক্যো-পনিষৎ নিবদ্ধ গভীর প্রণবতত্ত্ব এবং নাদব্রহ্মবাদে পর্য্যবসিত হয়—তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। ভিন্ন

ভিন্ন শব্দের সহিত মনোগত পৃথক্ পৃথক্ ভাবের নিগূঢ় নিত্য সম্বন্ধ আলোচনা করিয়াই কালে ঐ বাদের উৎপত্তি হয়, এবং ক্রমে উহা বিশাল কায়া ধারণ করিয়া নাদ বা শব্দ হইতে জগদুৎপত্তি নির্দ্ধারিত করে।

বাহ্যান্তরভেদে কত প্রতীকের যে এইরূপে কালে কালে উদয় হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হওয়া সুকঠিন। ঐ সমস্ত প্রতীকের আলম্বনে যে যে শক্তি-প্রকাশ মানব অনুভব করিত, এক মহান্ ঈশ্বরবিশ্বাসে উপনীত হইয়া, কালে সে সকলকে তাঁহারই বিভূতিরূপে গণনা করিতে শিখিল। গীতার দশমাধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে যে পদার্থে যে যে ভগবদ্‌বিভূতি দর্শনের উপদেশ অর্জ্জুনকে করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটিই প্রাচীনকালে পৃথক্ পূজা পাইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

এইরূপে খণ্ড খণ্ড বাহ্য প্রতীক সমুদয় একত্রীভূত হইয়া, এক বিরাট্ দেবতনুতে এবং খণ্ড খণ্ড আন্তর প্রতীকসমূহ সমষ্টিভূত হইয়া এক মহান্ আন্তর প্রতীকে কালে পর্য্যবসিত হইল—মানব, বিশ্ব-বিরাট্ এবং কুলকুণ্ডলিনী শক্তির উপাসনা করিতে শিখিল। তত্ত-দালোচনা আমাদের অন্য সময়ে করিবার ইচ্ছা রহিল।

পঞ্চম প্রস্তাব

শক্তিপ্রতীক—নারী

সহস্র সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা—ইতিহাসের তখন জন্মই হয় নাই।—তবে কালনির্ণয় আর করিবে কে ? জগতের সেই প্রাচীন যুগের অতি প্রাচীন কাহিনী সম্বন্ধে ইউরোপের বর্ত্তমান কালের পুরাণজ্ঞ সূতকুল (antiquarian researchers) এই কথা বলিয়া থাকেন :—

বর্ব্বর জগৎ তখন অজ্ঞানপ্রসূত নিবিড় অমানিশা সমাচ্ছন্ন। যে দিকে যতদূর দেখ, তমঃশক্তির সহিত রজঃশক্তির ঘোরতর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। মানবের মাংস পিণ্ডময় স্থূল দেহাপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠশক্তিসম্পন্ন অথচ তদন্তর্গত মনের ন্যায়, বহিঃপ্রকৃতির স্থূল স্থষ্টির অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি—মানব-মানবীকে অধিকার করিয়াই পূর্ব্বোক্ত দ্বন্দ্ব বিশেষভাবে প্রকাশিত। প্রথম

ক্ষুধার তাড়না, দ্বিতীয় অত্যধিক শীত, বাত, উষ্ণতাদি ও বন্য পশ্বাদির হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা, তৃতীয় আসঙ্গলিপ্সা, প্রভৃতি নানা প্রেরণায় মানব-মানবীর অন্তর্নিহিত রজোগুণ ক্রমশঃ বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ এবং জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে লাগিল। আহারের নিমিত্ত ফল মূল অন্বেষিত হইল ; যখন তাহা জোটা কঠিন হইল, তখন পশুবধ ও মাংসভোজন চলিতে লাগিল। গিরিগুহা, মৃতস্তূপাদির সন্ধান এবং পরে শীত নিবারণ ও বাসের জন্য তদনুকরণে পর্ণাচ্ছাদন রচিত হইল। হে দেবি মানবি!—তমোগুণময়ী হইয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করিলেও তখন হইতেই তুমি সেই বর্ব্বর নরের সহচরী!

ক্রমে অনিশ্চিত খাদ্যসঞ্চয়কে আয়ত্তাধীনে রাখিবার জন্য পশু-পালনবৃত্তির প্রারম্ভ। মানবকুল তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিস্তৃত—কিন্তু ঐ বিস্তারে এখনকার ন্যায় বিবাহপ্রথার নামগন্ধও নাই। আসঙ্গলিপ্সাই সে সম্মিলনে প্রজাপতি, কামই পুরোহিত এবং ছল-বল-কৌশলাদিই উহার মন্ত্র তন্ত্র! উহার কতকাল পরেও 'দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ, প্রভৃতি নিয়মে, এবং অতিবৃদ্ধ মনুর নয় প্রকারের বিবাহ এবং নয় প্রকার পুত্রের

কথা লিপিবদ্ধ করাতেই পূর্ব্বোক্ত বিষয় প্রমাণিত। নূহবংশীয় লটের দুহিতাদ্বয় অপর পাত্রের অভাব দেখিয়া পিতাকেই মধুপানে মত্ত করিয়া গর্ভধারণ করিলেন।* ঐরূপ আরও কত বিসদৃশ সম্মিলনে যে মানবকুলের প্রথম বিস্তৃতি, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? নিত্য নির্ব্বিকার ঈশ্বর ভিন্ন, সে সকল বিপরীত সম্মিলন সম্মুখে দেখিলে আমাদের ন্যায় সামান্য জীবের কাহার মন না অসীম লজ্জা ও ঘৃণায় ম্রিয়মান হইয়া সমগ্র মনুষ্যজাতিকেই শত ধিক্কার প্রদান করিবে।

এইবার এক প্রকারের স্বার্থচেষ্টা মানবকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দলবদ্ধ করিতে লাগিল। বন্য পশুকুল স্বজাতির সহিত একত্র দলবদ্ধ থাকায় পরস্পরের কত সহায় হয় দেখিয়া এবং একাকী অপর বর্ব্বর মানব ও হিংস্র শ্বাপদকুলের হস্ত হইতে নিজ সহচরী ও পশু প্রভৃতিকে রক্ষা করিতে যাইয়া বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মানব বুঝিল একত্র চেষ্টায় বলবৃদ্ধি, একত্র বাসে বিশেষ লাভ। তখন মানব ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে আপনাকে নিবদ্ধ করিল; এবং মণ্ডলীর অন্তর্গত ব্যক্তি সকলের একত্র পশুচারণ, এবং রাত্রিকালে একই স্থানে

---

* Genesis, XIX. 30—38.

পশু বন্ধন করায় একত্র বাসের প্রথা প্রচলিত হইল। মণ্ডলিমধ্যগত সর্ব্বাপেক্ষা বলবুদ্ধিশালী পুরুষের অন্য সকলের উপর প্রভুত্ব বিস্তৃত হইল এবং তাহারই নামে ঐ মণ্ডলী সর্ব্বত্র পরিচিত হওয়াতে 'গোত্র' সকলের উৎপত্তি হইল। গোত্রস্থ প্রত্যেক নারীই তখন গোত্রপতির বিশেষভাবে এবং গোত্রমধ্যগত অপর সকল পুরুষের সমভাবে উপভোগের পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইল। এইরূপে গোত্রের সহিতই নারীর প্রথম বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। দ্রৌপদীরূপিণী নারী তখন এককালে শত পতির মনোরঞ্জনে ব্যাপৃতা হইলেন! অসহায় একক নরের সমসুখদুঃখভাগিনী পূর্ব্বসহচরী তখন মণ্ডলি-বলপুষ্ট দর্পিত মানবের পাশব-প্রবৃত্তি-চরিতার্থ-কুশলা পরাধীনা দাসীমাত্রে পরিণতা হইলেন!

তখন গোত্রসকল আবার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিল। এক গোত্র অপর গোত্রের নারী ও গোধন যখনই পারিল, ছলে বলে আত্মসাৎ করিতে লাগিল, এবং কখন বা যুদ্ধবিগ্রহে অপর গোত্রস্থ সকল পুরুষের নিধন সাধন করিয়া, তাহাদের যাবতীয় নারী ও পশু অধিকার করিয়া বসিল। ঐরূপে অনেক গোত্রের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। অসহায়া অবলা নারী

তখন বলবান মানব-হস্তের ক্রীড়াপুত্তলি হইলেন!—দেবরাজ্ঞী শচীর ন্যায়, যখন যে ইন্দ্রত্ব লাভ করিল, হাস্যমুখে তাহারই বামে তখন উপবেশন করিয়া তাহারই মনোরঞ্জনে প্রবৃত্তা হইলেন!

এইবার পশুকুলের পালন ও খাদ্যসংগ্রহে সদলবলে দূরসঞ্চারী গোত্রকুল পশুপ্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে সচেষ্ট হইল। এইরূপে কৃষির উৎপত্তি ও ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া নিয়ত পর্য্যটনশীল অনিশ্চিতাবাসস্থান মানবমণ্ডলিসকলকে বিশেষ বিশেষ জনপদে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল। পল্লীগ্রামসমূহের উৎপত্তি ক্রমে দেশ-সকলের সূচনা হইল। কিন্তু মানবের অবস্থার উন্নতি হইলে কি হইবে? হে দেবি মানবি! তোমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না! দাসী দাসীই রহিল! পশু প্রভৃতি ধনের ন্যায় সৌন্দর্য্যভূষিতা নারী পাশববলদৃপ্ত মানব-প্রভুর অন্যতম রত্নমধ্যেই পরিগণিতা রহিলেন!

ক্রমে বহু গোত্রসমূহ একই স্বার্থচেষ্টায় একত্র মিলিত হইয়া, 'সুমের' জাতির অভ্যুদয় এবং কালে বাবিলে সাম্রাজ্য স্থাপন। দমূজি ও আদুনেইয়ের পূজাপ্রচারে সকাম প্রবৃত্তমার্গের পূজার চূড়ান্ত অভিনয়। জীবসৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়তা নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে

'পিতৃমুখ ও মাতৃমুখ' স্বরূপে বর্ণিত যোনি ও লিঙ্গের উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইল! দেবীমন্দিরে পূর্ব্বা-পরিচিত পুরুষাঙ্কে শয্যা-লাভ-করা-রূপ নারীর বিবাহ-প্রথা প্রচলিত হইল!

নিয়ত বর্দ্ধমান 'সুমের' জাতিরই এক ভাগ ক্রমে বাসের জন্য 'সুজলা সুফলা' ভূমিবিশেষের অন্বেষণে নির্গত হইয়া স্ত্রী-পুং-চিহ্নের উপাসনাদি লইয়া ভারতে প্রবেশ করিল। অনেক কাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া ভারতে বাসের পর উহারই এক শাখা আবার মালাবার উপকূল হইতে নৌযানে মিসরে যাইয়া নীলনদতীরে অপর এক সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের সূচনা করিল! এইরূপে ধন-ধান্যসম্পদ-গৌরবে পূর্ব্বাপেক্ষা মানবের অনেক পদবৃদ্ধি হইল। মানবীর অন্তর্নিহিতা দৈবী শক্তিও মানবের স্বীয় অবস্থোন্নতি-প্রবৃত্তির উত্তেজিকা হইয়া সর্ব্বকাল সঙ্গে বাস ও তাহার সন্তানসন্ততি ধনজনাদির পালন ও রক্ষণে সহায়তা করিয়া সেই প্রাচীন যুগেই পৃথিবীর বহু স্থানে বহুভাবে বহুজন দ্বারা সকাম ভক্তির সহিত পূজিতা ও উপাসিতা হইলেন! সে উপাসনার মূলমন্ত্র—মানবের স্বার্থ-সুখান্বেষণ, সে দেবীর প্রয়োজন—মানবের ভোগতৃপ্তি

পর্য্যন্ত! কিন্তু ঐরূপ হইলে কি হয়? দুর্গন্ধাবিল পঙ্কাশ্রয়ে মধুগন্ধসমাকুল ফুল্ল দেবভোগ্য শতদলের ন্যায় মানবের ঐ ইন্দ্রিয়সুখৈষণা ভোগৈষণা ও আসঙ্গ-লিপ্সাপূর্ণ সাগ্রহ সকাম ভক্তি হইতেই কালে মানবমন নারীপ্রতিমায় জগদম্বার হ্লাদিনী শক্তির উপাসনা করিতে শিখিল! ত্রিজগৎ-প্রসবিনী শক্তিকে কালে বিরাট নারীমূর্ত্তি স্বরূপে কল্পনা করিয়া তদবলম্বনে জগন্মাতার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতে শিখিল!

প্রবৃত্তির জটিলারণ্যে মানব যখন ঐরূপে দিঙ্‌নির্ণয়ে অসমর্থ হইতেছিল, মানবীর শরীরমনের কমনীয় কান্তিকলায় সম্যগাকৃষ্ট হইয়াও যখন সে তাহার ভিতর "সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ চন্দ্রকোটিসুশীতল" দেবীমূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাইতেছিল না, তখন ভারতের দেবকুল দেবদ্রুমপরিশোভিত অভ্রভেদী হিমাচলশৃঙ্গে জগতের যাবতীয় নারীশরীরমনের সমষ্টিগঠিতা হৈমবতী উমার উজ্জ্বল কাঞ্চনগৌরমূর্ত্তির প্রথম সন্দর্শনে ধন্য হইলেন। দেবজগৎ স্তম্ভিতহৃদয়ে বালার্করূপিণী অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবিনী ব্রহ্মশক্তি দেবী মানবীকে নীলাম্বরে সুখাসীনা দেখিলেন এবং তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে তাঁহার মহিমাবাণী শ্রবণ করিলেন—

“অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং

* * *

ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি
যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষীয়ন্তি
শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥

* * *

যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিম্ তং সুমেধাম্।”

—ঋক, দেবীসূক্ত।

“আমিই সমগ্র জগতের রাজ্ঞী, আমার উপাসকেরাই বিভূতিসম্পন্ন হয়; আমিই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না, সকল যজ্ঞে আমারই প্রথম পূজাধিকার; দর্শন, শ্রবন, অন্নগ্রহণ ও শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণিজগতের সমগ্র ব্যাপার আমার শক্তিতেই সম্পাদিত হয়; সংসারে যে কোন ব্যক্তি শুদ্ধভাবে আমার উপাসনা না করিয়া আমার অবজ্ঞা করে, সে দিন দিন ক্ষীণ ও কালে বিনষ্ট হয়; হে সখে! অবহিত হইয়া যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর—শ্রদ্ধার দ্বারা যে ব্রহ্মবস্তুর সন্দর্শন লাভ হয়, আমিই

তাহা ; আমার কৃপাতেই লোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ; আমার কৃপাকটাক্ষেই পুরুষ—স্রষ্টা, ঋষি এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন হয় !”

দেবকুল হইতেই ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলে নারীমূর্ত্তির কামগন্ধহীন পূজার প্রথম প্রচার। উপনিষৎ-প্রাণ ঋষি দেবীমহিমা প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া গাহিলেন—

“অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ ॥”—শ্বেতাশ্বতর।

“শুক্লকৃষ্ণরক্তবর্ণা সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, অনন্যসম্ভবা এক অপূর্ব্বা নারী অনন্যসম্ভব এক পুরুষের সহিত সংযুক্তা থাকিয়া আপনার অনুরূপ বহু প্রকারের প্রজা-সকল সৃজন করিতেছেন”—ইত্যাদি।

আত্মস্বরূপে বর্ত্তমানা দেবীমহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি শিক্ষা দিলেন—“ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।” —বৃহদারণ্যক, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৫ম ব্রাহ্মণ, ৬।

“জায়ার ভিতরে আত্মস্বরূপিণী দেবী বর্ত্তমানা

বলিয়াই লোকের জায়াকে এত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়।”

ঋষিদিগের পদানুসরণে কৃতার্থ হইয়া অতি বৃদ্ধ মনু আবার গাহিলেন—

দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্দ্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্দ্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥”

—মনুসংহিতা ১—৩২।

“সৃষ্টিরপূর্ব্বে ঈশ্বর আপনাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া এক অংশে পুরুষ এবং অপরাংশে নারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন ও সঙ্গত হইলেন। অতঃপর সেই নারী, বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ শরীর বলিয়া বোধ করিতেছেন যে পুরুষ, তাঁহাকে প্রসব করিলেন!” বলদৃপ্ত মানব এতকাল আপন সুখের জন্য, আপন স্বার্থের জন্যই নারীর পালন ও রক্ষণ করিতেছিল; বৃদ্ধ মনু তাহাকে এখন নারীকে সহধর্ম্মিণী জ্ঞানে সম্মানের চক্ষে দেখিতে শিখাইয়া তাহাকে নারীপূজায় আর এক পদ অগ্রসর করিলেন।

“যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ॥

মনু—৩।৫৬।

"যে গৃহে নারীগণ পূজিতা হন, সেই গৃহে দেবতা-সকলও সানন্দে আগমন করেন ; আর যে গৃহে নারীগণ বহুমান লাভ না করেন, সে গৃহে, দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি কোন ক্রিয়াই সুফল প্রসব করে না।"

এইরূপে ভারতের আর্য্যগৌরব ঋষিকুলই জগতে নারীমহিমা প্রথম অনুভব ও প্রচার করিলেন। সকাম জগৎ নির্ব্বাক্ ও উদ্‌গ্রীব হইয়া তাঁহাদের সেই পূতবাণী শ্রবণ করিল—মোহিতচিত্তে নারীপ্রতীকে কামগন্ধ-মাত্রহীন মাতৃপূজার, দেবীপূজার, তাঁহাদের সেই আয়োজন দেখিতে থাকিল এবং মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের যথাসম্ভব পদানুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল ! হে দেবি মানবি ! এইরূপে ভারতই তোমার দেবীমূর্ত্তির নিষ্কাম পূজা জগতে প্রথম করিয়া ধন্য হইল—সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিল ! ভারত সেই দিন হইতেই তোমায় কুলদেবীরূপে গৃহে গৃহে পূজা ও সম্মান করিতে থাকিল !

সে সম্মান, সে শ্রদ্ধা ও পূজার ফল ভারত প্রত্যক্ষ পাইল ! সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, দময়ন্তি প্রভৃতি স্ত্রীসৌন্দর্য্যভূষিতা উজ্জ্বল দেবীপ্রতিমাসকল সর্ব্বাগ্রে

ভারতে পদার্পণ করিয়া দেশ পবিত্র করিলেন, পুণ্যময় ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিলেন। হে ভারত-সন্তান, বৈদেশিক অনুকরণে আজ কিনা তুমি নিজ কুললক্ষ্মীর চরিত্র ও জীবন গঠনে অগ্রসর। অস্বাভাবিক শিক্ষা-সম্পন্ন হীনবুদ্ধি বর্ব্বর! তোমার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির কি অবনতিই হইয়াছে! একবার বৈদেশিক মোহের নিবিড়াঞ্জন নয়ন হইতে অপসৃত করিয়া ভূতজগতে দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে—জগতেরআদর্শস্থানীয়া দিব্য-নারীকুল একমাত্র ভারতেই হিমাচলস্তরেব ন্যায় অনুল্লঙ্ঘনীয় শ্রেণীতে তোমার কুললক্ষ্মীর সহায়তা করিতে দণ্ডায়মানা! তাঁহাদের পদরজে কেবল ভারত নহে, কিন্তু সাব্ধিদ্বীপা সকাননা সমগ্র পৃথিবীই সর্ব্ব-কালের জন্য ধন্যা ও সগৌরবা হইয়াছেন! মূঢ়! ভাব দেখি, ভারতের মৃত্তিকা—যাহাতে তোমার ও তোমার কুললক্ষ্মীর শরীরমন গঠিত হইয়াছে, ভারতের ধূলি—যাহা তোমার ও তাহার অঙ্গে আশৈশব লাগিয়া শরীর দৃঢ় করিয়াছে, তাহা সীতা, দ্রৌপদী, বুদ্ধৈকপ্রাণা যশোধরা, চৈতন্য-ঘরণী বিষ্ণুপ্রিয়া, ধর্ম্মপ্রাণা অহল্যাবাই বা চিতোরের বীররমণীকুলের দেবারাধ্য পদস্পর্শে পবিত্রিত! ভাব দেখি—ভারতের

বায়ু—যাহা প্রতি নিঃশ্বাসে তোমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া শরীর পুষ্ট করিতেছে, তাহা ঐ সকল দেবীদিগের পবিত্র হৃদয়ে যুগে যুগে প্রবেশ লাভ ও ক্রীড়া করিয়া তাঁহাদের পবিত্রতায় ওতপ্রোতভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। —দেখিবে, তোমার এ পাশ্চাত্য মোহ মরুমরীচিকার ন্যায় কোথায় সরিয়া গিয়াছে; আর উহা জলশূন্য বিজন মরুতে তোমাদের জলের প্রত্যাশায় ঘুরাইতে পারিবে না! তোমার জগন্মাতা নারীকুলের উপর, বিশেষতঃ ভারতের রমণীকুলের উপর হৃদয়ের ভক্তি প্রেম উথলিত হইয়া তোমাকে আবার যথার্থ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবে এবং তোমরা কুললক্ষ্মীকে সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমায় পরিণত করিবে।

নারীর ভিতর জগৎপ্রসূতির বিশেষ বিকাশ প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াই ভারতের দিব্যদর্শনসম্পন্ন ঋষিকুল মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, নারী বুদ্ধিরূপা, শক্তিরূপা, জগজ্জননার হ্লাদিনী, সৃজনী, ও পালনী শক্তির জীবন্ত প্রতিমাস্বরূপ। ঐ প্রত্যক্ষানুভব সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইত কিন্তু বহু সাধকের অনেককালব্যাপিনী সাধনার যে আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। বৈদিক, ঔপনিষদিক ও দার্শনিক যুগের নারী-উপাসনার সহিত

বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকযুগের ঐ বিষয়ের তুলনায় আলোচনা করিলে উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বৈদিক ঔপনিষদিক যুগের নারী-উপাসনা ধীর, স্থির শান্তভাবের। উহাতে উন্মত্ত প্রবাহের তাণ্ডবগতি নাই, অথবা ভীষণ আবর্ত্তের প্রসারে উপাসকের চিত্ত-বিভ্রম উৎপন্ন করিয়া চিরকালের মত নিমগ্ন করিবার প্রভাব নাই। বৈদিক ঋষি পুরুষশরীরের ন্যায় নারী-শরীরেও সমভাবে আত্মার বিকাশ অবলোকন করিয়া সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সহিত নারীকে সমানাধিকার প্রদান করিয়া, তাঁহার পূজা ও সম্মান করিলেন। পরমাত্মার সাক্ষাৎ সন্দর্শনে এবং পবিত্র স্পর্শে নারীও যে পুরুষের ন্যায় অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা অবনতমস্তকে স্বীকার করিলেন। ঋক্ প্রভৃতি সংহিতা এবং উপনিষদের স্থানে স্থানে নারীঋষিকুলের উল্লেখ, জনকাদি রাজার সভায় ধর্ম্মবিচারে গার্গীপ্রমুখ নারীগণের পুরুষের সহিত সমভাবে যোগদানের উল্লেখ এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞক্রিয়ায় রাজার সহিত রাণীরও যোগদানের উল্লেখ থাকাই ঐ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ। এ ত গেল আধ্যাত্মিক জগতের কথা। ব্যবহারিক জগতেও নারীকুল পুরুষের সহিত যে বৈদিক যুগে

সমসম্মান প্রাপ্ত হইতেন, তদ্বিষয়েরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে আমাদের কথায় কেহ যেন ইহা না বুঝিয়া বসেন যে, সংসারের কতকগুলি কার্য্যে যে নারীকুলেরই স্বভাবগত বিশেষাধিকার, এ কথা বৈদিক যুগে স্বীকৃত হইত না। উহা সর্ব্বযুগেই ভারতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং পরেও হইবে। তবে পাশ্চাত্য প্রদেশে খৃষ্ট জন্মিবার পাঁচ ছয় শতাব্দীর পর পর্য্যন্তও যেমন নারীজাতিকে হেয়জ্ঞান করিয়া, তাহাদের ভিতর আত্মার অস্তিত্বই নাই, তাহারা পুরুষের ন্যায় কোনরূপ বিষয়সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হইবার যোগ্যাই নহে, ইত্যাদি বিসদৃশ কথার স্বীকার এবং তদনুরূপ কার্য্যও সমাজের সর্ব্ব-বিভাগে অনুষ্ঠিত হইত, বৈদিক যুগ হইতে কখন যে ভারতে এরূপ মত প্রচার ও কার্য্যানুষ্ঠান হইয়াছিল এবিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আবার বৈদিক যুগের বিবাহপ্রথায়, কুমারীকন্যার মাতৃত্বশক্তি বিকাশের অধিকারিণী হইবার প্রথম পরিচয়প্রাপ্তিমাত্র "গর্ভং দেহি সিনীবালি," ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার "মাতৃমুখের" পূজাদির বিধান থাকায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐকাল হইতেই ভারত নারীতে মাতৃপূজা করিয়া আসিতেছে। মাতৃমুখ বা স্ত্রীচিহ্নের বেদোক্ত

ঐ পূজা যে দ্রাবিড়জাতির মধ্যগত স্ত্রীচিহ্নের পূজার বা তন্ত্রোল্লিখিত মাতৃমুখের পূজার ন্যায় ছিল না, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। উদ্দেশ্যের প্রভেদ দেখিয়াই ঐ কথা অনুমিত হয়। বৈদিকী পূজার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র মাতৃত্ব-শক্তির সম্মান; প্রাচীন দ্রাবিড়ি অনুষ্ঠানসকলের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিতা নারী-শক্তিরই পূজা; এবং তান্ত্রিকী পূজার লক্ষ্য, মাতা এবং জায়া উভয়ভাবে প্রকাশিতা নারীশক্তিরই মহিমা-প্রচার।

বেদে ঐরূপে নারীর মাতৃত্বশক্তির পূজাবিধান অল্প বিস্তর প্রাপ্ত হইলেও দ্রাবিড় জাতির ন্যায় স্ত্রীপুংচিহ্নের উপাসনার কোনও প্রমাণই পাওয়া যায় না। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, ঐ উপাসনা সুমের এবং তচ্ছাখা দ্রাবিড় জাতিরই নিজস্ব—বৈদিক আর্য্যদিগের নহে; নতুবা বেদেই উহার প্রমাণ পাওয়া যাইত। তিনি আরও বলিতেন, লিঙ্গাইত শৈবসম্প্রদায়, লিঙ্গো-পাসনা বেদবিরুদ্ধ নহে এবং অথর্ব্ববেদনিবদ্ধ যূপস্কম্ভের (স্তম্ভের) উপাসনাই লিঙ্গোপাসনা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, কারণ যদি ঐরূপই হইবে, তবে বেদের অন্য কোন স্থলেই স্ত্রী-পুং-

চিহ্নের পূজা-পরিচায়ক কোনও মন্ত্রবিধানাদি প্রমাণ-স্বরূপে পাওয়া যায় না কেন? শিবলিঙ্গের পূজা যে পুং-চিহ্নের উপাসনা নহে, তাহার অন্য প্রমাণ উহার পূজাকালে পূজকের 'ধ্যায়েন্নিতং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং'—ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানধারণা করা। এজন্য বেদোক্ত বহুপ্রাচীন শিবপূজার এবং বৌদ্ধযুগের স্তূপসমূহের সহিত সংযোগ করিয়াই যে কালে বর্ত্তমান লিঙ্গোপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহাই স্বামিজী যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।

জায়ার ভিতর দিয়া প্রকাশিতা নারীশক্তির দ্রাবিড়ি অনুকরণে পূজা বৌদ্ধযুগেই ভারতে প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল; এবং কোনও নূতন ভাবের প্রথমোদয়ে লোকে যেমন উহাকেই সর্ব্বে সর্ব্বা ভাবিয়া সর্ব্বত্র সকল কার্য্যেই উহার সংযোগ ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, প্রায় সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া তদনুরূপ ভাবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। সেজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধ-যুগের তন্ত্রসকলের শিক্ষা—সকল রমণীর ভিতর কেবলমাত্র ঐ শক্তিরই সম্মাননা করা। সংযমী পুরুষ-সকলের ঐ শিক্ষায় কোনও ক্ষতি হইল না বটে—কিন্তু ঐরূপ সংযমী পুরুষ কোনও জাতিবিশেষের ভিতর

কয়টা দেখিতে পাওয়া যায়? ইন্দ্রিয়পরবশ অসংযমী ইতরসাধারণ মানব ঐ শিক্ষা স্থূলভাবে গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধযুগের শেষভাগে ভারতে যে কি অনাচার-ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল,তাহার আংশিক পরিচয় এখনও পুরী এবং দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগাত্রস্থ বিপরীত পশুভাবসূচক মূর্ত্তিগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের তন্ত্রকার সেজন্য অতি সাবধানে, অধিকারিভেদে রমণীর জায়াভাবের উপাসনার প্রবর্ত্তনা করিয়া এবং বেদের অনুগামী হইয়া জনসাধারণে রমণীর মাতৃভাবের পূজারই বহুল প্রচার করিয়া বৌদ্ধযুগের ঐ দোষ পরিহার করিলেন। পঞ্চ 'ম'-কার সংযুক্ত তন্ত্রোক্ত বীরভাবের পূজা, যাহা সাধারণতঃ বামাচার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাতেই নারীর জায়াভাবের উপাসনা যে নিবদ্ধ রহিয়াছে, একথা আর বলিতে হইবে না। ঐ বীরভাবের প্রয়োগকুশল সিদ্ধগুরু এবং অনুষ্ঠানকুশল সংযমী শ্রদ্ধাবান্ সাধক—উভয়ই বিরল। উপযুক্ত গুরু লাভ করিয়া বিবাহিত ব্যক্তির ঐ ভাবের উপাসনায় উন্নতি লাভ হইতে পারে; কিন্তু যাহারা দারপরিগ্রহ করেন নাই, তাঁহাদের ঐ ভাবের উপাসনায় সহসা অগ্রসর হইলে পথভ্রষ্ট হইয়া পতন্ হইবারই

বিশেষ সম্ভাবনা। সিদ্ধগুরু-সহায়ে সংযমী ব্যক্তিই কেবলমাত্র ঐ ভাবের উপাসনায় সিদ্ধকাম এবং উন্নত হইয়া থাকেন একথা আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

'বামাচার' শব্দের অর্থ বুঝিলেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। 'বাম' শব্দ এখানে 'বিপরীত' অর্থবাচক। অর্থাৎ পঞ্চ 'ম'-কারাদি পদার্থ গ্রহণে ইতরসাধারণে যে প্রকার উন্মত্তবৎ অসংযত আচরণ করিয়া থাকে, তদ্বিপরীত আচরণযুক্ত হইয়া পূর্ণসংযমে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সাধককে শিক্ষা দেওয়াই বামাচারের উদ্দেশ্য। অথবা ঐ সকল পদার্থের গ্রহণে ইতরসাধারণ মানবের অধর্ম্ম ভাবেরই উদ্দীপনা হইয়া থাকে; তদ্রূপ না হইয়া যাহাতে সুপ্তা কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া সাধককে অধিকতর সংযম, অধিকতর ধর্ম্মভাব আনিয়া দেয়, তাহাই ঐ আচারের লক্ষ্য। আবার তন্ত্র বলেন, কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিতা হইয়া মস্তকস্থ সহস্রারে উঠিবার সময় মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি চক্রকে বামাবর্ত্তে পরিবেষ্টন এবং তচ্চক্রস্থ বর্ণসকলকে নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া লয়েন; এবং সমাধি-ভঙ্গের পর মস্তক হইতে পুনরায় মেরুচক্রে আসিবার সময় প্রতি চক্রকে বিপরীতভাবে অথবা দক্ষিণাবর্ত্তে

পরিবেষ্টন করিতে করিতে নিম্নে নামিয়া আসেন; কুণ্ডলিনী শক্তিকে ঐরূপে জনসাধারণে অপরিচিত বামাবর্ত্তে পরিভ্রমন করাইয়া সহস্রারে উঠাইয়া সমাধিমগ্ন হইতে যে আচার শিক্ষা দেয়, তাহাই বামাচার —ঐ শব্দের উহাও অন্যতম অর্থ। বামাচার শব্দের তন্ত্রোক্ত ঐ সকল অর্থের অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যায়, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া বামাচারের উদ্দেশ্য নয়; এবং কঠোর ত্যাগী শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রচারিত প্রেমধর্ম্মকে যেমন বর্ত্তমান কালের বাবাজী বৈরাগীদের ব্যভিচারের জন্য অভিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত নহে, তেমনি ধর্ম্মের নামে অনুষ্ঠিত বৌদ্ধযুগের এবং বর্ত্তমান কালের ব্যভিচারসমূহের জন্য তন্ত্রোক্ত বামাচারকে দোষী নির্দ্ধারণ করাও যুক্তিযুক্ত নহে।

মানবপ্রকৃতির স্বভাব পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা বামাচারের সম্বন্ধে আর একটি কথাও সহজে বুঝিতে পারি। মানবকে যে বিষয়টির অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করা যায়, আমাদের মধ্যে এমন বিপরীতপ্রকৃতিবিশিষ্ট অনেক লোক আছে, যাহারা সেই বিষয়টিই অগ্রে করিয়া বসে! বামমার্গনিষিদ্ধ বস্তুসকলেরও ধর্ম্মে একভাবে প্রয়োজনীয়তা আছে বলায়, ঐরূপ স্বভাববিশিষ্ট লোক-

সকলের ভিতরে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তির উদয়ের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ধর্ম্মাচরণ করিতে আসিয়া তাহাদিগকে প্রবৃত্তির প্রেরণায় আর কপটাচারের আশ্রয় লইতে হয় না। বামমার্গের নিন্দাই সাধারণতঃ শুনিতে পাওয়া যায়। উহাতে যে কিছু ভাল আছে, একথা কাহাকেও বলিতে শুনা যায় না। আবার ঐ মার্গের সাধারণ গুরুরা অধিকারী নির্ব্বাচন না করিয়া সকলকেই ঐ পথের উপদেশ করিয়া সময়ে সময়ে অনেকের পতনের কারণ হইয়াছেন। তজ্জন্য আবার বামমার্গকেই লোকে দোষী করিয়াছে। ঐ সকল কারণেই বামমার্গের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি কথা বলিতে হইল।

ভারতের তন্ত্র ঐরূপে নারীর মাতৃ ও জায়ারূপ উভয় ভাবের উপাসনার প্রবর্ত্তনা করিয়া নারীপ্রতীকে বিশ্বজননীর উপাসনা সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন করিলেন; আর কুম্ভকার যেমন বাঁশ, বাখারি, খড়, মৃত্তিকাদিসহায়ে সুন্দর দেবীমূর্ত্তি গঠন করিয়া সাধকের পূজার সহায় হয়, ভারতের দার্শনিকগণ, বিশেষ আবার মহামুনি কপিল তদ্রূপ প্রকৃতিপুরুষবাদাদি নিজ নিজ মত প্রচারে তন্ত্র-কারের সেই অসিমুণ্ড-বরাভয়করা, সৌম্যকঠোর,

জীবনমৃত্যুরূপ সর্ব্বপ্রকার বিপরীতভাবের সম্মিলনভূমি-স্বরূপা মাতৃমূর্ত্তির গঠনে সহায়তা করিলেন। তান্ত্রিক সাধক শ্রদ্ধা ও সংযম-সহায়ে ভক্তিপূরিত-চিত্তে ঐ মূর্ত্তির পূজা করিতে করিতে কালে সমাধিস্থ হইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই সে মূর্ত্তি জীবন্ত, জাগ্রত, বিশ্বের সর্ব্বত্র ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত! সমাধিসহায়ে স্থূলবিশ্ব হইতে পৃথগ্‌ভাবে দূরে অবস্থিত হইয়া তিনি অনন্ত স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপাকৃতি দেখিলেন—এক বিরাট শবশিবামূর্ত্তি! আর উহার মধ্যগত যত কিছু বিভিন্ন পদার্থ, উহারা সকলেই সেই শবশিবার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নখ-কেশ-লোমাদিরূপে নিত্য বিরাজমান! হর্ষ, বিস্ময়, ভয় প্রভৃতি অনন্ত ভাবে তাঁহার হৃদয় এককালে উদ্বেলিত হওয়ায় তাঁহার মুখ হইতে প্রথম বাক্য নিঃসৃত হইল—

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং॥

* * *

এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং শ্মশানালয়বাসিনীম।

এইরূপে সমাধিমুখে বা ভাবমুখে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াই যে সিদ্ধ সাধকেরা বিশ্বরূপিণী, বিশ্বজননীর

বিবিধ রূপের ও বিবিধভাবের ধ্যান ও মন্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়েন, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

নারীর বিভূতি বা জায়াভাবের উপাসনা, পাশ্চাত্য বহু প্রাচীন কালে দ্রাবিড় জাতির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। তখন কারণপ্রিয়, ভূজগভূষিত উক্ষদেব (Bacchus) ও তচ্ছক্তি ঐশী (Isis) ইউ-রোপের নানাস্থানে নানাভাবে পূজা পাইতেন। বিরল সংযতমনা সাধকেরা শুদ্ধভাবে তাঁহাদের পূজা করিত। আর অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ইতরসাধারণ উঁহাদের পূজার নামে ব্যভিচারের প্রবল স্রোত পাশ্চাত্যের নানা স্থানে যে প্রবাহিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহা প্রমাণিত করে। উক্ষদেবের পূজায় নরনারীসকল গভীর নিশীথে গুপ্তচক্রে একত্র মিলিত হইয়া মদ্যপান এবং নানা অসংযতাচরণ যে করিত, প্রাচীন ইতিহাসে এ বিষয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলাদের ভিতরেও ঐরূপ পূজানুষ্ঠানের প্রচার ছিল। জগদ্বিজয়ী অসামান্য বীর আলেক্জাণ্ডারের মাতার ঐরূপ পূজানু-ষ্ঠানের কথা ইতিহাস-নিবদ্ধ। খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐরূপ অনুষ্ঠানসকল যে অতি সাধারণ ছিল, ইতিহাস পাঠে ইহাও বুঝিতে পারা যায়।

বৌদ্ধ ও ইরানী ধর্ম্মের সারভাগ নিজাঙ্গে মিলিত করিয়া নবীন খৃষ্টধর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত পূজার বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং কালে শার্ল্ম্যান্-প্রমুখ রাজন্যবর্গকে নিজ মতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাদের তরবারির সহায়েই নিজ প্রাধান্য স্থাপনে সমর্থ হয়। ছলে বলে কৌশলেই যে খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপে প্রাচীন যুগে একাধিপত্য লাভ করে ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। সে যাহাই হউক, ঈশামাতা মেরীর পূজা প্রচলন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম পাশ্চাত্যে প্রথম, নারীর মাতৃভাবে পূজার কথঞ্চিৎ প্রচার করিয়াছিল। মাতৃপূজার ঐ বীজ কিন্তু ফলফুল-সমাচ্ছন্ন মহান্ মহীরুহে পরিণত হইয়া ভারতের ন্যায় পাশ্চাত্যকে প্রতি নারীর ভিতর ঐ ভাবের পূজা ও সম্মাননা করিতে শিখাইতে পারে নাই! ইউরোপের মাতৃপূজা ঐ মেরীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত যাইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না। বহু প্রাচীন উক্ষদেবের পূজাকাল হইতে নারীতে জায়াভাব বা শক্তিভাবের যে পূজা ও সম্মাননা করিতে ইউরোপ ক্রমে শিখিতেছিল, খৃষ্টধর্ম্মের নবীন প্রবর্ত্তনায় সে তাহা ছাড়িতে পারিল না। তবে কালে কথঞ্চিৎ শুদ্ধভাবে নারীর ঐ ভাবের পূজা করিতে শিখিল মাত্র।

সমগ্র পাশ্চাত্য যে ঐ ভাবে নারীজাতির বিশেষ

পূজা ও সম্মাননা করে, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ! ইউরোপী পুরুষ নারীকে অগ্রে আসন, অগ্রে বসন, অগ্রে ভোজন দেয়। ট্রাম বা রেলগাড়ীতে স্থানাভাবে কোন রমণী দণ্ডায়মানা রহিয়াছেন দেখিলে, তৎক্ষণাৎ নিজে দাঁড়াইয়া আপন স্থানে তাঁহাকে বসিতে দেয়। যানারোহনের সময় রমণীদের অগ্রে উঠাইয়া পরে আপনি উঠে—ইত্যাদি নানা প্রকারে স্ত্রীজাতির সম্মাননা করিয়া থাকে। কিন্তু উপর উপর না দেখিয়া একটু তলাইয়া দেখিলেই উহা যে নারীর মাতৃভাবের পূজা নহে, শক্তিভাবের বা 'গৃহলক্ষ্মী' 'কুললক্ষ্মী' 'দেবী' 'আনন্দময়ী' প্রভৃতি শব্দনিহিত নারীর সংসারপালন, পুরুষ-নিয়ামক ঐশ্বর্য্যভাব—যে ভাব ঘনীভূত হইলে কালে মধুর বা জায়াভাবে পরিণত হয়—সেই ভাবেরই উপাসনা, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। কারণ, ইউরোপী পুরুষের ঐ পূজা ও সম্মান অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী বা রূপযৌবনগলিতা বৃদ্ধা নারী কদাচ পাইয়া থাকেন। সর্ব্বাগ্রে যুবতী এবং পরে প্রৌঢ়া নারীগণই ঐ সম্মানের বিশেষ ভাবে অধিকারিণী। আবার রূপসৌন্দর্য্যভূষিতা প্রৌঢ়ার সম্মুখে কুরূপা যুবতীও ঐ পূজায় নিম্নাসন পাইয়া থাকেন। আবার অপরিচিত পুরুষ অপরিচিতা নারীকে

সম্বোধন করিতে যাইয়া মাদাম (Madam) বা মিসিস্ (Mistress) প্রভৃতি যে সকল সম্মান-সূচক শব্দ প্রয়োগ করেন, তাহাও যে নারীর শক্তিভাব বা ঐশ্বর্য্য ভাব-দ্যোতক, তাহাও এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য। ইউরোপী পুরুষদিগের ঐরূপ আচরণ দেখিলেই আমাদের পূর্ব্বোক্ত কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ভারতের তন্ত্র শক্তিপূজায় নারীর মাতৃভাবের উপাসনার প্রাধান্যই যে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ভারতের পুরুষকুলের নারীজাতীর প্রতি ব্যবহারেই স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে বৃদ্ধা বর্ষীয়সী নারীই পুরুষের সম্মান অগ্রে পাইয়া থাকেন। রূপ-সৌন্দর্য্যভূষিতা নারী স্বায় স্বামীর জননীর অধীনে না থাকিলে নিন্দাভাগিনী হন। উদ্ধত বধূর পরামর্শে পুত্র যদি জননীকে কোনরূপে অবহেলা করেন বা তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন ত স্ত্রী-জিত অধর্ম্মাচারী বলিয়া নিন্দিত হইয়া থাকেন। অপরিচিতা রমণী প্রৌঢ়া হইলে 'মা,' যুবতী হইলে কন্যাবাচী 'বাছা' বা 'মা লক্ষ্মী' ইত্যাদি শব্দে অভিহিতা ও সম্মানিতা হয়েন। মাতাই সর্ব্বাগ্রে পূজা পাইয়া থাকেন এবং মাতৃসম্বোধনে সম্বোধিত হইলেও রমণীকুল নিঃশঙ্কচিত্তে অপরিচিত

পুরুষের সহিত বাক্যালাপ ও আবশ্যক হইলে তৎকৃত সেবা বা সাহায্যও গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্যান্য নানা বিষয়েও ঐরূপ আচরণ দেখিয়া নারীর মাতৃভাবের পূজা যে ভারতের কতদূর অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বেশ অনুমিত হয়।

জগৎকারণ ঈশ্বরকে 'জগজ্জননী,' 'জগদম্বা' প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া নারীভাবে উপাসনা করা ভারতেরই নিজস্ব সম্পত্তি। পাশ্চাত্য প্রভৃতি ভারতেতর দেশে ঈশ্বরের পিতৃভাবে উপাসনারই প্রচলন দেখা যায়। শুধু তাহাই নহে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিশিষ্ট সাধকগণের অনেকে ঈশ্বরের নারীভাবারোপ করা মহাপাপের মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন। আবার নারীর শক্তিভাব বা ঐশ্বর্য্যভাবের বহুকাল হইতে উপাসনা করিয়া আসিলেও, ভারতের তন্ত্রোক্ত বামমার্গে যথার্থ বীরসাধকগণের ন্যায় পাশ্চাত্যের কোন সাধকই ঐ ভাব ঈশ্বরে আরোপ করিয়া, তিনিই 'আমার শক্তি'—এই ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে সাহসী হন না। বহু প্রাচীন কালে ঐ ভাবের কিছু কিছু নিদর্শন ইউরোপী বিশিষ্ট সাধককুলের ভিতর পাওয়া যাইলেও, বর্ত্তমানে উহার নামগন্ধও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রাচীন

যুগের ইউরোপীয় কোন কোন খৃষ্টান সাধিকার ঈশ্বরে বা ঈশ্বরাবতার ঈশায় পতিভাব আরোপ করিয়া সিদ্ধিলাভের কথা শাস্ত্রনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশার ধ্যানে ও ভাব-সমাধিতে তাঁহারা এমন তন্ময় হইতেন যে, ক্রুশারোহণকালে ঈশার যে যে অঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের সেই সেই অঙ্গের সেই সেই স্থান হইতে শোণিত-নির্গমের কথাও লিপিবদ্ধ আছে। অপর দিকে আবার উপাস্য মেরীমূর্ত্তির সহিত অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া তাঁহাকেই নিজশক্তি ভাবিয়া চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য পালনের কথাও ইউরোপের প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট সাধক—পণ্ডিত ইরাস্‌মসের জীবনচরিতে লিপিবদ্ধ আছে! ভারতের শক্তিপূজারই ভাবানুগত হইয়া যে ইউ-রোপের প্রাচীন যুগের ঐ সকল সাধকের ভিতর ঐরূপ ভাবসিদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-সহায়ে বেশ অনুমিত হয়। পরবর্ত্তী যুগসকলে ভারতের সহিত ঐ সম্বন্ধ যত রহিত হইয়াছে, ততই ইউরোপ ঐ ঐ ভাবসহায়ে আধ্যাত্মিক জগতে অগ্রসর হইবার ও সিদ্ধিলাভ করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহার উপর মার্টিন লুথর-প্রবর্ত্তিত প্রটেষ্ট্যাণ্ট ধর্ম্ম, পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসের বিরোধী হইয়া কেবলমাত্র নীতিসহায়ে

মানবকে জীবন গঠন করিতে শিক্ষা দিয়া, ইউরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের মূলে এককালে কুঠারাঘাত করিয়াছে। আবার, জড়বিজ্ঞানের প্রসারে ইউরোপের দৃষ্টি বর্ত্তমানকালে কেবলমাত্র জড়েই নিবদ্ধ থাকায়, তাহাকে একেবারে ইহকাল-সর্ব্বস্ব করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই যে প্রকারেই হউক, সংসারের ভোগসুখ লাভই ইউরোপাদি পাশ্চাত্য দেশসমূহের এখন পরম পুরুষার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। ইউরোপের আধ্যাত্মিক জীবনের এ গাঢ় অমানিশার কখন অবসান হইবে কি না, তাহা ঈশ্বরই বলিতে পারেন। আশাভরসার মধ্যে কেবল ইহাই দেখা যায়, যে, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের সহায়ে ভারতের ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান যুগে পুনরায় আমেরিকা ও ইউরোপে কথঞ্চিৎ প্রবিষ্ট হইয়া ধীরে ধীরে পুষ্ট ও প্রসারিত হইতেছে।

যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যাবির্ভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজা ভারতে বর্ত্তমান যুগে আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রতীকে এমন শুদ্ধ ভাবের শক্তিপূজা জগৎ আর কখন দেখিয়াছে কি না, সন্দেহ। জগন্মাতার ধ্যানসমাধিতে নিরন্তর তন্ময় হইয়া থাকা এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিয়া

পঞ্চম বর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার উপর সর্ব্বদা সকল বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করা, সকল নারীর ভিতর জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়া সকল সময়েই তাঁহাদের যথার্থ ভক্তিপূর্ণচিত্তে মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ উপাস্য ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করা, বিবাহিত হইলেও প্রাপ্তযৌবনা পত্নীর সন্দর্শন মাত্র মাতৃভাবের প্রেরণায় তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ জগদম্বারূপে দর্শন করিয়া মাতৃসম্বোধন করা এবং জবা বিল্বদল দিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম পূজা করা, ঘৃণ্য বেশ্যারমণীকুলের ভিতরেও জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়া তাহাদিগকে মাতৃসম্বোধনে সম্মানিত করিয়া সমাধিস্থ হওয়া, সর্ব্বজনসমক্ষে ভক্তিপূতচিত্তে কুলাগারপ্রতীকে জগদ্‌যোনির পূজা করিয়া আনন্দে সমাধিমগ্ন হওয়া, তান্ত্রিকী পূজার উপকরণ 'কারণ' দেখিবামাত্র জগত-কারণের কথা মনে উদিত হইয়া প্রেমে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া পড়া এবং সর্ব্বোপরি জগন্মাতার প্রেমে আত্মহারা হইয়া স্বার্থপর ভোগসুখ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যে সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যময় জীবন ভিন্ন জগৎ আর কোথায়, কোন্ যুগে কোন্ অবতারপুরুষের জীবনেই বা, নারীপ্রতীকে শক্তি-

পূজার ঐরূপ জ্বলন্ত উচ্চাদর্শ দেখিয়াছে? তাঁহার অলৌকিক জীবনালোকের সহায়েই, হে ভারত, তোমাকে এখন হইতে পবিত্রভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। হে ভারত-ভারতি, গুরূপদিষ্ট হইয়া পশু বা বীর যে ভাবাবলম্বনেই তোমরা নারীপ্রতীকে শক্তিপূজায় অগ্রসর হও না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবন সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া তদনুষ্ঠান করিও; এবং তাঁহার এই কথা হৃদয়ে স্থির ধারণা করিয়া রাখিও যে, ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যসহায়ে একাঙ্গী ভক্তিপ্রেমে সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে কোনও ভাবে পূজা করিয়াই জগন্মাতার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে না; জানিও 'ভাবেরঘরে চুরি' থাকিলেই ঐ পূজা বিপরীত ফল প্রসব করিবে!

হে বীর সাধক, তোমাকেই অধিকতর অবহিত থাকিতে হইবে। তোমাকেই ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম পথ দিয়া অগ্রসর হইয়া নারীপ্রতীকে জগচ্ছক্তিরূপিণী জগদম্বার পূজা করিতে হইবে। প্রবৃত্তির কুহকে ভুলিয়া তোমারই ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়া পদস্খলিত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। জানিও ভারতের তন্ত্রকার তোমার জন্য নিশিপূজার বিধান করিয়া তোমাকে দিবাপেক্ষা

নিশিতেই অধিকতর অবহিত থাকিতে সঙ্কেত করিতেছেন —কারণ হিংস্র শ্বাপদকুলের ন্যায় ভীষণ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিশার তিমিরাবগুণ্ঠনেই নিঃশঙ্ক প্রচরণে সাহসী হইয়া উঠে। ভাবিও না নিষ্কামভাবে নারীপূজা তোমার ভাবাশ্রয়ে হইবার নহে! নিস্তেজ-ইন্দ্রিয়গ্রাম বৃদ্ধ দম্পতির শরীরসম্বন্ধ উঠিয়া যাইয়া পরস্পরের প্রতি ঘনীভূত প্রেমসম্বন্ধে অবস্থিত হইবার কথা একবার স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, পুরুষের নিকট রমণী তখন সখী-ভাবে পরিণতা; অথবা রমণীতে এবং জননীতে তখন আর বিশেষ প্রভেদ কোথায়? কালধর্ম্মে তাহারা তখন যে অবস্থায় উপনীত, অবহিত থাকিয়া সাধনাসহায়ে সর্ব্বকাল নারীর সহিত তোমায় ঐ ভাবে অবস্থিত থাকিতে হইবে; তবেই তোমার ভাবসিদ্ধি উপস্থিত হইবে। বিপদ্ সমূহ, কিন্তু তজ্জন্য তোমাকে তোমার গুরূপদিষ্ট মার্গত্যাগ করিতে বলিতে পারি না। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাহারও ভাব কখনও নষ্ট করেন নাই বা কাহাকেও তদ্রূপ করিতে শিক্ষা দেন নাই। অবহিত থাকিয়া, ত্যাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুদ্ধভাবে উপাসনায় রত থাকিলে তুমিও কালে জগদম্বার দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইবে—

গুরুভক্ত, শ্রদ্ধাবান্ সাধক, এই কথা তোমাকেও তিনি বার বার বলিয়া অভয় দিয়াছেন। অতএব জগদ্গুরুর শ্রীপাদুকার ধ্যান করিয়া, তাঁহার ঐ অভয়বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া, অবহিত হইয়া শক্তিপূজায় অগ্রসর হও—ধন্য হও!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ প্রণীত। যে সার্ব্বজনীন উদার আধ্যাত্মিক শক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণ ও পরিচয় পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ বেলুড়মঠের প্রাচীন সান্ন্যাসিগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জগদ্‌গুরু ও যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, সে ভাবটী বর্ত্তমান গ্রন্থে অতি উত্তমরূপে বিবৃত হইয়াছে; তাহার প্রধান কারণ—গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁহাদের অন্যতম। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের অলৌকিক মহদুদার জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এরূপ ভাবের পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

সমগ্র গ্রন্থখানি ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ। যথা :—পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন,—১৵৹ আনা। গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ,—১৷৹ আনা। গুরুভাব—উত্তরার্দ্ধ,—১৷৹ আনা। সাধকভাব,—১৷৹ আনা। দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ,—১৷৵৹ আনা।

"উদ্বোধন"পত্রের গ্রাহকগণ প্রত্যেক খণ্ড যথাক্রমে নিম্নলিখিতরূপ কম মূল্যে পাইবেন—১৲, ১৴৹, ১৴৹, ১৴, ১৷৹ আনা।

স্বামিজীর সহিত হিমালয়ে—সিষ্টার নিবেদিতা প্রণীত—"Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda" নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। এই পুস্তকে পাঠক স্বামীজীর বিষয়ে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিবেন;—ইহা নিবেদিতার 'ডায়েরী' হইতে লিখিত। সুন্দর বাঁধান, মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ—শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত—(ষষ্ঠ সংস্করণ) স্বামীজী ও বর্ত্তমানকালে ধর্ম্ম, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি নানা সমস্যামূলক বিষয় সকলে তাঁহার মতামত সংক্ষেপে জানিবার এমন সুযোগ পাঠক ইতিপূর্ব্বে আর কখন পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৲ এক টাকা।

নিবেদিতা—শ্রীমতী সরলাবালা দাসী প্রণীত (ষষ্ঠ সংস্করণ)—স্বামী সারদানন্দ লিখিত ভূমিকা সহিত। বঙ্গসাহিত্যে সিষ্টার নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় তথ্য-পূর্ণ এমন পুস্তক আর নাই। বসুমতী বলেন—"* * * এ পর্য্যন্ত ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে আমরা যতগুলি রচনা পাঠ করিয়াছি, শ্রীমতী সরলাবালার 'নিবেদিতা' তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা আমরা অসঙ্কোচে নির্দ্দেশ করিতে পারি।" * * * —মূল্য ।৹ আনা